অনুরোধ।

সাধু-দর্শন বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু কএকটী অনিবার্য্য কারণে বিলম্ব হইয়া পড়িল।

১ম কারণ। গ্রন্থকার, স্বামীদ্বয়ের আরও বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেক বিষয় অবগত হইবার সুযোগও পাইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে গ্রাহকগণ অধিক বিলম্ব জন্য বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায় প্রাপ্ত সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তক সম্পূর্ণ করিলেন।

২য় কারণ। ছাপাখানার অত্যাচার। দুই তিন প্রেস্ ঘুরিয়া অবশেষে নিজে ছাপাখানা খুলিয়া পুস্তক প্রকাশ করিলাম। এই জন্য "অনুরোধ" গ্রাহকগণ আমাদের পুস্তক প্রকাশে বিলম্বের কারণ বুঝিয়া আমাদের ক্ষমা করেন।

প্রকাশক।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্রজ মহাশয় শ্রীচরণেষু।

দাদা! শাস্ত্রে উক্ত আছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমতুল্য। কিন্তু মনে হয় যেনবা ইহাতেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রকৃত মাহাত্ম্য বলা হইল না। বীরবরেন্দ্র শ্রীমান্ লক্ষ্মণ প্রাণসম জ্যেষ্ঠের জন্য পিতৃবধেও উদ্যত হইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস "সহোদরের" ন্যায় প্রকৃত আত্মীয় সংসারে অসম্ভব। এক রামলক্ষ্মণের চরিত্র আঁকিয়া বাল্মিকী জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন। তাই বলি সহোদরের তুল্য আত্মীয় জগতে কেহ নাই। শাস্ত্রেই ঋষিগণ কর্ত্তৃক বারম্বার উক্ত হইয়াছে যে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই চেষ্টায় মিলিবার সম্ভব, কিন্তু কোন চেষ্টাতেই সহোদর মিলিবার সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্মণগতপ্রাণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া উন্মাদে রোদন করিয়া জগৎ সমক্ষে যে মনোহর আদর্শ চিত্র করিয়াছেন তাহা সহস্র মহাপ্রলয়ে ধৌত হইবার নহে। আর যখন সেই বীরকেশরী শ্রীমান্ লক্ষ্মণ পরমপূজ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের জীবন রক্ষার জন্য অকাতরে বক্ষঃ পাতিয়া সেই বিষম মহাশক্তিশেল ধারণ করিলেন, আহা! তখনকার সে দৃশ্য ভাবিতে হৃদয় মনঃ স্তম্ভিত হইয়া যায়, হায়! কোথায় সেই দেবপ্রতিম জগদাদর্শ মহাচেতা লক্ষ্মণ,

আর কোথায় কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন নরকার্ণবনিমগ্ন আমার ন্যায় কৃমি কীট। এরূপ অকৃতি অধম ভ্রাতাকেও আপনি যেরূপ অকপট স্নেহ এবং বাৎসল্য ভাবে লালন পালন করিয়া যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আমি, ইহ জীবনেত দূরের কথা, শত জন্মেও শুধিতে পারিব কি না সন্দেহ। দাদা! আবার যখন মনে হয়, যে কেবল একমাত্র আপনার স্নেহেই এতদিন জীবিত থাকিয়া সদ্গুরু এবং সাধুসঙ্গরূপ অমৃত পানে অমরত্ব লাভে আশান্বিত হইয়াছি, তখন আপনার সেই অকপট স্নেহ ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি, আনন্দস্রোতে নয়ন প্লাবিত হইয়া পড়ে।

দাদা। এই দীনহীন জীবনে এতদিন যাবৎ এমন কোন দ্রব্যেরই আহরণ করিতে পারি নাই যাহা দ্বারা আপনার ঐ দুর্লভ চরণ বন্দন করিতে সক্ষম হইব। তবে আপনারই প্রসাদাৎ সাধুসহবাস দ্বারা যৎসামান্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই চরণপ্রান্তে সমর্পণ করিয়া এ জীবন সার্থক করিব। সাধুসঙ্গের ফলস্বরূপ এই "সাধু-দর্শন" পুস্তক খানি শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম, আশা এ দীনের এই যৎসামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন্ যাহাতে ইহজীবনে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গরূপ অমৃতপানে সক্ষম হই।

আপনার চির বিনীত ভৃত্য

শ্রীভূধর দেব শর্ম্মণঃ।

সাধু দর্শন।

প্রথম খণ্ড।

সাধু মাহাত্ম্য।

সদাচার, সদ্ব্যবহার, সদনুষ্ঠান, সাধুগ্রন্থ অধ্যয়ন সৎবার্ত্তালোচনা প্রভৃতি, পবিত্র জীবন গঠনোপযোগী উপায় সকল মধ্যে, সাধুসেবা, সাধুসংসর্গ ও সাধুসন্দর্শন প্রভৃতি উপায় সকলই মুখ্যতম। শাস্ত্রই বলেন—

"অম্ময়ানিচ তীর্থানি যে দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।

তে পুনন্তুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

"গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল জলময় তীর্থ এবং গদাধর অন্নপূর্ণা প্রভৃতি যে সকল পাষাণাধিষ্ঠিত দেবতা, তাঁহাদিগকে সেবা করিলে বরং দীর্ঘকালে তাঁহারা মনুষ্যকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধু দর্শনমাত্রেই জীবকে নিখিল কলুষ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন"। সাধুগণ, যে স্থানে উপবেশন করেন, যে স্থানে স্নানাহার করেন, যে দেশ

দিয়া গমন করেন, সে স্থান, সে দেশ, পবিত্র হইয়া যায়, এমনই সাধুহৃদয, সাধু আত্মার শক্তি।

আবার বলিতেছেন,—

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বংসাধু-সমাগমঃ।

অর্থ,— গঙ্গা পাপ, শশী তাপ এবং কল্পতরু দারিদ্র হরণ করেন কিন্তু একমাত্র সাধু সমাগম পাপ তাপ দৈন্য সমস্ত অপহরণ করেন। আর এক স্থানে আছে,

সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নযনদ্বয়ং।
যস্য নাস্তি সএবান্ধঃ কথং নস্যাদমার্গগঃ॥

অর্থ,— সৎসঙ্গ ও বিবেক, ইহাই নির্ম্মল নযনদ্বয, সে নয়ন যাহার নাই সে অন্ধ কেন বিপথগামী না হইবে ?

এইরূপে শাস্ত্রে নানা স্থানে নানা ভাবে সংসারাসক্তি শূন্য নির্ম্মলচেতা সাধু মহাত্মাগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শোকতাপ পরিক্লিষ্ট জীবগণকে সাধু সহবাস অবলম্বনে ভূরি ২ উপদেশ দিযাছেন।

যদিও পূর্ব্বোক্ত উপায গুলির, আমাদের সমাজে অনেক স্থলে অনেক সময অনেকাংশে, সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শেষোক্ত বিষয গুলির, যে প্রায়ই অসদ্ভাব, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সদাচার, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি নিজের আযত্তাধীন কার্য্য, ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা থাকিলে, একদিন না একদিন সাধিত হইতে পারে,

কিন্তু সাধুসন্দর্শন, কিম্বা সাধুসঙ্গলাভ, সহস্র ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও, সংসিদ্ধ হওয়া নিতান্তই সুদুষ্কর—অথচ পারমার্থিক কল্যাণ পক্ষে সাধুসঙ্গ দ্বারা যত সহজে আত্মা উন্নতি লাভ করিতে থাকে, উল্লিখিতরূপ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা তত সহজে কদাচ সম্ভবে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে—শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, মনস্বী মুনি ও ঋষি-মণ্ডলী এ পাপ কলুষদূষিত ঘোরকপটাচার পরিপূর্ণ সংসারারণ্যে বিচরণ করেন কি না তাহাই সন্দেহ। তৎপর, কত শোক-তাপাক্রান্ত সংসারী-জীব সাধুদর্শন লালসায় চিত্তোদ্বেলিত হৃদয়ে অতি কঠিন আয়াশ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ণ অধ্যবসায়ের সহিত, নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ চক্ষু-মন তৃপ্তিকর, আত্মার নির্ম্মল-শান্তিপ্রদ-মূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহ সংসারে সেরূপ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন সাধু পুরুষ আর নাই? শাস্ত্র কি তবে মিথ্যা? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমাদের অদৃষ্ট দোষে এবং সংসারের বিকৃত পরিবর্ত্তনে, তাঁহাদের প্রকৃতিস্থ দেহ, মন, আত্মা এই সমস্ত অপ্রকৃতিস্থ লোকসংসর্গে আসিতে নিতান্তই সঙ্কুচিত হয়, তাহাই তাঁহারা সমস্ত নগর প্রান্তবর্ত্তি-অরণ্য পর্য্যন্ত পরিহার পূর্ব্বক কোন নিভৃত গুহাদি আশ্রয় করিয়াছেন,—সে স্থান আমাদের দুরধিগম্য, সুতরাং আমরা তাঁহাদের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাইনা

বলিয়া কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, সে অজর অমর নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পুরুষ সমূহ, ঈশ্বরের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন? তাহা হইলে এরূপ সম্ভাবে দিন রাত্রি বহিত না, সংসার সুশৃঙ্খলায় অতিবাহিত হইত না। সকলেই আছেন, কিন্তু পাপী আমরা, অদৃষ্ট বিপাকে পড়িয়া, সে সৌম্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া হৃদয় মন চরিতার্থ করিতে পারি না। আমরা এতক্ষণ যে সমস্ত মহাত্মাদের সম্বন্ধে বলিয়া আসিলাম, ইঁহারা নির্ব্বাণ মুক্ত মহাপুরুষ। সুতরাং তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করা আমাদের দুরাশা মাত্র। ইহা নিশ্চয়, যে যখন সংসার ত্যাগী ধর্ম্মপিপাসু পরিব্রাজকগণও কত ব্যাকুল হৃদয়ে, বহুতর কষ্টে অতি নিভৃত প্রদেশে গমন করিয়াও যাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পান না, এবং দেবতারাও সময়ে সময়ে যাঁহাদের আরাধনা করিয়া পাননা, তখন, তাঁহারা যে সর্ব্বদা আমাদের ন্যায় বিষয় লিপ্সু সাংসারিক কীটদিগের গোচরে আসিবেন এরূপ আকাশ-কুসুমবৎ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আর এক শ্রেণীর সাধুপুরুষ আছেন যাঁহারা লোক সন্নিধানেই বাস করেন, অথচ ইহারই মধ্যে যতটা নির্জ্জন ও পবিত্র স্থান সম্ভব তাহাই অনুসন্ধান করিয়া লয়েন। এবং সেইখানেই আপনার সংকল্প ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধন ভজনও অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। কত শত যাত্রী দর্শন

মানসে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গদগদ-ভাবে পূজা অর্চ্চনাদি করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সাধকের দৃষ্টি নাই। তিনি একমনে একধ্যানে আপন কার্য্যে রত রহিয়াছেন। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই তাহার রমণীয়তা অনুভব করিয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছে। যদিও এই শ্রেণীরই সাধুপুরুষগণ সময়ে সময়ে আমাদের নয়ন পথে পতিত হন, তথাপি ইহাঁদের সংখ্যাও অতি অল্প। কেবল পুণ্যধাম কাশী, গয়া, কনখল, নর্ম্মদাতীর প্রভৃতি কএকটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানেই ইহাঁদের দর্শন পাওয়া যায়। ইহাঁরাই আমাদের ন্যায় সংসারীগণের আদর্শপুরুষ স্বরূপ। সুতরাং ইহাঁদের জীবনীই আমাদের আলোচনীয় ও অনুসরণীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই যাঁহাদের অনুসরণ করিব, যাঁহাদের আদর্শ লইয়া এপাপ জীবনের সংস্কার করিব, তাঁহাদের যে সেই জীবন্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা দর্শন করি, সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সাধু প্রসাদ লাভ করি, তাহা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। কোথায় পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে গঙ্গাতীরে কোন এক জনশূন্য স্থানে এক মহাপুরুষ আপন মনে আপন ধ্যানে, পাগলের ন্যায় বসিয়া কি করিতেছেন, কোথায় কনখলের পর্ব্বত গুহায় বসিয়া আর একজন মহাপুরুষ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি স্বরূপে নিরোধ করিয়া, ভগবানের আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন, এ দৃশ্য স্বয়ং-চক্ষে দেখিয়া, প্রাণেমনে ঐক্য করিয়া আমাদের ন্যায় কল্প-

জন, সে আদর্শ অনুসরণ করিতে সক্ষম হন? আমরা এতই সংসারমোহেজড়িত যে এতদূর গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হই, ইহা আমাদের চেষ্টায় বা সামর্থ্যে কুলায় না।

শুনা যায় পূর্ব্বে অনেক সাধুমহাত্মা সময়ে সময়ে তীর্থ ভ্রমণার্থ বাহির হইয়া দেশ-বিদেশীয় গৃহস্থ সকাসে আতিথ্য স্বীকার করিতেন। গৃহস্থও সাধুদর্শনলাভে জীবন সার্থক হইল জ্ঞান করিয়া, পরম যত্নে ও তীব্র আগ্রহে অতিথি সৎকার করিতেন। সাধুরাও ভদ্র জনোচিত সৎকারে প্রীত হইয়া হৃদয় খুলিয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় আশীর্ব্বাদ করিতেন, গৃহস্থ পরমানন্দে কুশলে দিনযাপন করিতেন। কিন্তু এখন, আমরা ধর্ম্ম কর্ম্মে সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই হউক, অথবা এ ঘোর অনাচারী, কপটী, অধার্ম্মিক জনপূর্ণ দেশে আসিয়া তাঁহাদের পবিত্র হৃদয় পাছে কলুষিত হয় এই ভয়েই হউক, তাঁহারা কিন্তু এদেশে ভুলক্রমেও পদার্পন করেন না। শাস্ত্রে আছে, যে দেশ সাধুসমাগম বর্জ্জিত সে দেশ সত্বরই মরুভূমিতে পরিণত হয়, প্রজাগণ উচ্ছন্নে যায়, রাজা শত্রু-কর্ত্তৃক বিদলিত হন। আমাদেরও সুতরাং দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে।

অধুনা সর্ব্বদা একটি অভিযোগ শুনা যায়, যে, "এখন আর পূর্ব্বের ন্যায়, বেদব্যাস বশিষ্ট, শুকদেব নারদ, দুর্ব্বাসা কশ্যপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সদৃশ সাধুর দর্শন পাওয়া

যায় না, তাহার কারণ, সে সব মহাত্মারাত মৃত, সুতরাং তাঁহাদের পাইব কোথায় ? আর বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ব ঋষি-দের তুলনাত দূরের কথা, সাধারণই মনুষ্যের পরিচায়ক যে সমস্ত গুণ অর্থাৎ যে সমস্তের অভাবে মনুষ্যকে মনুষ্যই বলা যায় না, সে সমস্ত গুণ সম্পন্ন মনুষ্যও দুর্লভ। তবে সাধুসঙ্গ করিব কোথায় ?" ইত্যাদি। এ সমস্ত অন্যের পক্ষে প্রকৃত কথা হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর ইহা প্রকৃত কথা নহে। হিন্দু বলেন,—"ধর্ম্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপংনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" (শ্রুতি)। যদি ধর্ম্ম না থাকিত, যদি সাধু সজ্জন পৃথিবী হইতে একবারে অন্তর্হিত হইতেন তাহা হইলে কদাপি সংসার একমুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিতে না। ক্ষণমধ্যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মহা প্রলয়ের অনন্ত গর্ভে ডুবিয়া যাইত। তাই বলি ধর্ম্ম একবারেই বিলুপ্ত হয় নাই। আর "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকান" সুতরাং সাধু সজ্জনেরও একবারে অভাব হয় নাই। আমরা বিষয় কীট তাই আমাদের দূষিত চক্ষে সাধু সন্দর্শন ঘটে না। প্রথমতঃ সাধু চিনিবার শক্তি আমাদের একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার উপরে ভণ্ডের সংখ্যা অতি ভয়ঙ্কর রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভণ্ডের জন্য সাধুগণও প্রতারিত হইতেছেন। চক্ষের উপর দিয়া কত মহাজন সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তাহাই তাঁহাদের চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একেত

আমাদের চক্ষু দুষিত, তাহাতে আবার ভণ্ডের প্রতারনায় আমাদের এমনিই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, কষায়বস্ত্রধারী মাত্রেই প্রবঞ্চক, সুতরাং, সাধু সংসর্গ লাভ আমাদের সুদুর পরাহত। কিন্তু বুঝা উচিত যে মৃত্তিকা দ্বারা বহু মূল্য হিরকাদি রত্ন আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সেই মৃত্তিকা সহ সমস্তই জলে নিক্ষেপ করিব, না, ধীরে ধীরে মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া মধ্যস্থিত সেই অমূল্য হিরক খণ্ড নিষ্কাসিত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিব? আমরা সচরাচর যাহা কিছু ভাল দেখিতে পাই প্রায় তৎসমস্তই মন্দের সহিত মিসিয়া থাকে। মন্দ না থাকিলে ভালব ভালত্ব বুঝিব কি লইয়া? সংসারে "ভণ্ডতাপসই" অধিকাংশ, কিন্তু তাই বলিয়া কি সাধু অন্বেষণে বিরত হইব? কদাচ নহে। যেমন হিরক খণ্ড মৃত্তিকা দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপ পবিত্র চেতা নির্ম্মল হৃদয় সাধুগণও ভণ্ডগণেব দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকেন। প্রকৃত জহুবির ন্যায় মৃত্তিকা রাশি বিধৌত করিয়া তাঁহার সম্মান করিতে হইবে। আমি যদি মৃত্তিকা বোধে পরিত্যাগ করি রত্নের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার উজ্জ্বলতা যেমন ছিল তেমনিই থাকিবে, তবে আমি দুর্ভাগ্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া এই নিন্দিতজীবন কদাচ সার্থক করিতে পারিবনা। ক্ষতি আমারই, সাধুদের তাহাতে ক্ষতি কি?

আমরা যখন ৺ কাশীধামে অবস্থিতি করিতাম, তখন

কয়েকটী অতি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়াছি। একদিন সন্ধ্যার সময় দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া আছি, গঙ্গাতীরে বহুতর লোক সন্ধ্যা সমীরণ সেবনে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। কত ভাবে কত জন কত কি করিতেছে এখানে তাহার বর্ণনায় আবশ্যক নাই। ঠিক সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একজন কৌপীনধারী সুদীর্ঘায়তন দিব্যকান্তি পুরুষ ধীরে ধীরে আপন ভাবে-নিবিষ্ট থাকিয়া সোপানাবলি অবতরণ করিতে লাগিলেন। অগ্রাহ্যের সহিত দেখিলে বোধ হয় কোন একজন সাধারণ সন্ন্যাসী মাত্র। সুতরাং কেহই তাহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। তিনিও কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া গাত্র অবগাহনাদি দৈনিক কার্য্য সমাধান করিয়া প্রত্যাগমনো-দ্যত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার যেন হঠাৎ ভক্তি সঞ্চার হইল। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। কিছু দূর আসিয়া তিনি অতি সংকীর্ণ পথের উপর একটী বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আসিবার সময় দুই একবার পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিয়া আমায় দেখিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকার। কেবল সেই বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্টে একটি মাত্র দীপালোক প্রজ্জ্বলিত ছিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি মনুষ্য সমাগম মাত্রই নাই। ভয়

হইল। কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ২ সেই ক্ষুদ্র দীপালোকে আলোকিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সাধুটি এতাবৎ আমাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই। প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমার দিকে ফিরিয়া সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন "কে তুমি? আস্তে উত্তর করিলাম" আমি একজন সংসার ক্লিষ্ট ঘোর নারকী, আপনার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া এই অপবিত্র দেহ পবিত্র করিব"।

সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার নিকট আসিলে তোমার দেহ পবিত্র হইবে কিসে বুঝিলে?

আমি! আমার হৃদয় বলিতেছে তাই বুঝিয়াই আসিলাম।

সন্ন্যাসী। রাত্রি হইয়াছে গৃহে যাও।

আমি। (চরণ ধরিয়া) যতক্ষণ আপনার কৃপা না হইবে ততক্ষণ আমি গৃহে ফিরিব না।

সন্ন্যাসী। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা উপবেশন কর।

এই বলিয়া তিনি কৌপীন পরিবর্ত্তন ও সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলেপন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এই অবসরে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, দেখিলাম গৃহমধ্যে কেবল মাত্র একটি কমণ্ডলু ও একখানি কম্বলাসন মাত্র গৃহ সজ্জা। আর কোথায় কিছুই নাই! বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে জন মনুষ্যের শব্দ নাই। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিকটে উপবেশনান্তর আমার আর কোন ভয়ের সঞ্চার হইল

না, বরং ক্রমেই আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই সন্ন্যাসী নিজকার্য্য সমাধা করিয়া আমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেম "তুমি কোন দেশী ?"

আমি। বাঙ্গালী।

সন্ন্যাসী। আমার নিকট কেন আসিযাছ কোন জিজ্ঞাসা আছে কি ?

আমি! আমার অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি আগামী কল্য পর্য্যন্ত কি এখানে থাকিবেন ?

সন্ন্যাসী। না, আগামী কল্য আমার ত্রিযাম অতিবাহিত হইবে। আগামী কল্যই যাইব। কাশীর লোকের প্রকৃতি অতি দুষিত হইযাছে. সুতরাং এই অপবিত্র লোক সমাগমে থাকিলে ইন্দ্রিয বৃত্তি সকল বহির্দ্দিকে বিসর্পিত হইবার সম্ভব। যেখানে বহির্ম্মুখীন বৃত্তির স্রোত অতীব প্রবলা সেখানে দুর্ব্বল মনুষ্যের অন্তর্ম্মুখীন বৃত্তির পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব হইযা উঠে এবং প্রতিকূল সংসর্গে বিকৃতি হইবা পড়ে। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয। তবে ৺ কাশীক্ষেত্রের ক্ষেত্র মাহাত্ম্য কোন কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে তাহাই আমরা এই সমস্ত পুণ্য ক্ষেত্রে ভ্রমণ দ্বারা পুণ্য সঞ্চযে আসিযা থাকি। কিন্তু বাস করি না।

আমি। সাধুদের সর্ব্বদা আমরা দেখিতে পাই না কেন ? তাঁহারা কি লোক সমাগমে আসেন না ?

সন্ন্যাসী। সাধু সন্ন্যাসীগণ প্রায় তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে লোক সমাগমে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই অতি সতর্কে ও সাবধানে লোক সমাগম অতিক্রম করেন, সুতরাং লোকে তাঁহাদের চিনিযা উঠিতে পারে না। হয়ত তোমারই চক্ষের উপর দিয়া কত প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তোমারই তাচ্ছল্য দোষে তাঁহাদের চিনিতে পার নাই। আমরা নগর প্রান্তষ পল্লি প্রভৃতি সকল স্থানই ভ্রমণ করিয়া লক্ষিত পথে অগ্রসব হইয়া থাকি, কিন্তু এরূপ বেশে ও ভাবে থাকি, যে, সাধারণ লোকে যাহাতে কোনরূপ বিরক্ত করিতে না পারে।" ইত্যাদি—

এইরূপ আরও একজন সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয। তাঁহার হস্তে নিজের উদ্দেশ্য, গুণ, যশ, মর্য্যাদা বর্ণনাযুক্ত এক খানি সুদীর্ঘ প্রশংসা পত্র,—দেখিলেই বোধ হয় সাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য লোকটা যেন ফিরিতেছে। অনেক সাধ্যসাধনায প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হইল,—তিনি একজন প্রকৃত সাধু পুরুষ। কারণ জিজ্ঞাসার বলিলেন যে বাঙ্গলা দেশে কষায়বস্ত্র পরিধান দেখিলেই সকলে আসিয়া ধর্ম্ম কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রোগের ঔষধ পাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত করে। সুতরাং সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু এইরূপ প্রশংসা-পত্র দেখিলে আমাকে ভণ্ড বোধে ঘৃণা করিয়া নিকটে

আইসে না, সুতরাং আমাদের কার্য্যেরও ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না।

এই প্রকার সাংসারিক লোকের নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় সাধুগণ অতি সাবধানে বিচরণ করেন। কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় তাদৃশ সাধুগণের সন্দর্শন লাভে সমর্থ হওয়া যায়। প্রকৃত অনুরাগ থাকা চাই। ইহার উপর আবার যদি সাধুদিগের কৃপা হয় তাহা হইলে সমস্ত প্রকার ইপ্সিত ফল লাভে সক্ষম হওয়া যায়।

সাধুদিগের শান্তমূর্ত্তি সন্দর্শনের এমনই মাহাত্ম্য যে, দর্শন মাত্রেই যেন আত্মার সৎবৃত্তি গুলি সতই ফুটিয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কুপ্রবৃত্তি গুলিও চুপসিয়া যায়। জীবনের মধ্যে একবারও যদি একটি মাত্র সাধুদর্শন হয়, তাহা হইলেও সেই সাধুদর্শন জনিত যে আত্মার সাধুসংস্কার তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। যদি সর্ব্বদা স্মৃতিপথে তাঁহাদের শান্তির আধার প্রতিমা খানি সুদৃঢ় করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কুআকাঙ্ক্ষারূপ আবর্জ্জনারাশি আসিয়া, হৃদয়কে মলিন করিতে পারেনা। অথচ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে বর্ত্তমানযুগে আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের সে জীবন্তমূর্ত্তি সহজে দেখিবার উপায় নাই। তবে যাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা আছে ও তৎসঙ্গে উপায়ও আছে তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু একটি কথা আছে,—ইহা

আমরা বিশ্বাস করি যে, জীবন্ত মূর্ত্তি খানির পরিবর্ত্তে যদি কোন জ্বলন্ত প্রতিকৃতি দেখা যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ ফল না হউক অনেকাংশে যে জীবন্তমূর্ত্তি দেখার সমফল প্রদান করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত পিতামাতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, সৎপুত্রের মনে কতই ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও পৈত্রিক ঋণাদির স্মরণ হইয়া থাকে। ভগবান্ এবং ভগবতীর মৃৎ-পাষাণাদিময় প্রতিমূর্ত্তি দেখিযা ভক্তের হৃদযে কত আনন্দ কতপ্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হইযা থাকে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা দেব দেবীর প্রতিমা গঠন করিযা, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর সাজাইযা থাকি, ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্তদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করি। সতত পবিত্র ভাবোদ্দী-পক প্রতিমূর্ত্তি সমূহ নিরীক্ষণ করাতে হৃদয়ের প্রশান্ততা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মনঃপ্রাণ ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠে, চিত্তের জড়তা দূরীভূত হইয়া যায। সুতরাং সাধুসকাশে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের দর্শন করিতে যদি নাই পারি, অন্ততঃ যদি তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি কোন উপাযে সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে রাখিযা দিই, এবং যতদুর সম্ভব সাধুদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া অবকাশ অনুসারে পাঠ করি, তাহা হইলেও সমূহ উপকার দর্শিতে পারে। যাহাতে সহজে এই আশাটি মিটিতে পারে তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছি। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ সাধুদিগের প্রতিমূর্ত্তি সহ "সাধু জীবন চরিত" সংগ্রহ করিয়া

অবিকল ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সাধুদর্শন দ্বারা সাধুদিগের সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহাই ইহাতে প্রকটিত হইল বলিয়া এই গ্রন্থের নাম "সাধু দর্শন" রাখা হইল। আপাততঃ "সাধু দর্শন" ১ম খণ্ডে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রামকৃষ্ণ পরমহংস এই তিন মহাত্মার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইল।

মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

পাঠক! এই যে সৌম্য মূর্ত্তিটি দেখিতেছেন ইনি সমস্ত হিন্দুর পরিচিত ও পূজিত, মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী পরমহংস। ইঁহার প্রকৃতনাম কেহ অবগত নহেন, ত্রৈলিঙ্গদেশবাসী বলিয়া ইঁহাকে সকলে ত্রৈলঙ্গস্বামী বলে। মহাত্মার প্রশান্ত-ললাট-ফলক হইতে জ্বলন্ত ব্রহ্মণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, ইঁহার উপরি উপরি চঞ্চল এবং অভ্যন্তরে স্থিরভাব প্রকাশক নয়নদ্বয়-যুক্ত বিশাল ভালদেশ হইতে গম্ভীর জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, শান্তি ও আনন্দ প্রভৃতি সমস্তের জ্যোতি যেন সমষ্টিভাবে পিণ্ডীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইতেছে। নয়নদ্বয়ের মধ্যে কুটিলতা বা ঘৃণা বিদ্বেষাদি ভাবের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, ইঁহার দৃষ্টি অতি সরল এবং অপরিমিত আনন্দ ও শান্তির প্রকাশক। মুখভঙ্গী অতিশয় গম্ভীরতা প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অভিমান, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণা বা দৈন্যের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, মুখখানি সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও বরপ্রদ ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইঁহার, ভস্মাদি ধূসরিত এবং নগ্ন বৃহৎ কুক্ষিবিশিষ্ট মধ্য দেশটি অবলোকন করিলে অনাদিদেব মহাদেবের ভাব স্মরণ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক,

যোগীশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গী স্বামী।

যুবা, ভক্ত, অভক্ত, মিত্র, শত্রু সকলের উপরেই ইহাঁর দৃষ্টি ও প্রসন্নতার সমভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাঁকে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন এই সংসারের সমস্ত কথাই শুনিতেছেন, এবং নিকটবর্ত্তী বস্তু সকল সন্দর্শন করিতেছেন, কিন্তু একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা নহে, ইনি বাহিরের কোন বস্তুই দেখিতেছেন না ইনি যেন কোন দুর্লক্ষ্য ও দুশ্চিন্তনীয় বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে "তাহাতেই" সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রত্যাহৃত ও নিবিষ্ট করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁর বস্ত্র বা কৌপীনাদি কিছুই নাই, তথাপি ইহাঁর উদরটি এতই সুবৃহৎ ও লম্বমান্ হইয়া পড়িয়াছে যে, বসুন আর দাঁড়ান, ইনি যে উলঙ্গ তাহা কিছুই লক্ষ্য করা যায় না, পেটটি ঝুলিয়া পড়িয়া সম্মুখ দেশটা আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

ইহাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি অতি বিস্ময়কর কিম্বদন্তী আছে। প্রধানতঃ বয়স সম্বন্ধে এক বিচিত্রতা এই যে, কাশীবাসী অতি প্রাচীন (৯০।১০০ বৎসর বয়ঃক্রম) লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা প্রথমে যৌবনের প্রারম্ভে যখন কাশী আসিয়াছিলেন তখনও যেরূপ আকৃতি যেরূপ ভাব দেখিয়া গিয়াছেন, এখনও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছেন, কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর কাশীধামের বিদ্রোহীরা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ, বিদ্রোহী দমনে তথায় গমন

করেন। প্রথমেই তাঁহার উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের উপরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অমনিই যাবতীয় উলঙ্গ সন্ন্যাসী একত্রিত করিয়া বস্ত্র পরিধান জন্য নানারূপ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়। সেই অত্যাচারে কেবল ত্রৈলঙ্গস্বামী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই বস্ত্র পরিধান করিয়া অব্যাহতি পায়। কিন্তু মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী কিছুতেই দমিবার নহেন, অবলীলাক্রমে সমস্ত অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহাকে তিন দিন অনাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, ঐ দিবসত্রয় মধ্যেই দুরন্ত সাহেব শয্যাগত হইলেন, এমন কি জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সসম্মানে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং তৎসহ স্বামীজীর প্রতি কেহ কোন অত্যাচার কি কোন অনিষ্ট করিলে দণ্ডনীয় হইবে, এই মর্ম্মে সহর মধ্যে, ঘোষণা প্রচার করা হয়, এইরূপ কত শত আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলী ইহাঁর জীবনে সংঘটিত হইয়াছে তাহা আনুপূর্ব্বিক লিখিলে একখানি অতি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।

আমাদিগের একজন পরম পূজনীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি, বহুদিন যাবৎ কাশীধামে বাস করিয়া সপ্তচত্ত্বারিংশৎ বৎসর বয়সে কাশী প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, যে, তিনি যখন প্রথমাবস্থায় কাশী ক্ষেত্রে যান, তখন স্বামীজীর সাধনাবস্থা দর্শন করেন। তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় স্বামীজীর

নিকট কোন গুপ্ত স্থানে থাকিয়া তাঁহার অমানুষী কীর্ত্তি সমস্ত স্বচক্ষে অবলোকন করিতেন। কখন দেখিতেন, অতি প্রচণ্ড শীতে গঙ্গাসলিলে প্রবেশ করিয়া যোগ সাধনা করিতেছেন, কখন বা জলোপরি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। যে যাহা মুখে ধরিত তিনি তাহাই আহার করিতেন। কতকগুলি দুষ্টলোক ষড়যন্ত্র করিয়া একদিন ৫।৬ বোতল ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দেয়। স্বামীজীর ভক্তগণ এই বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আতঙ্কিত হৃদয়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। এইরূপ, ত্রৈলঙ্গস্বামী সম্বন্ধে, যোগসিদ্ধ পুরুষের পরিচায়ক, অসংখ্য ঘটনা সমূহের জাজ্বল্যমান্ ইতিহাস, বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাওয়া যায়।

যিনি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া স্বামীজীর সাধনার অদ্ভুত ক্ষমতা সকল পর্য্যবেক্ষণ কবিতেন, তিনি ক্রমশঃ স্বামীজীর সঙ্গ লালসায় এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে, অনাহারে, অস্নাতভাবে দিবারাত্র অতি সঙ্গোপনে মহাত্মার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বেড়াইতেন। কখন কখন বা তাঁহাব সন্নিহিত হইয়া নিজ জীবনের হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার বিষয় বিবৃত করিয়া কাতর ভাবে কত কাঁদিতেন। কিন্তু স্বামীজীর নিকট হইতে কোন উত্তরই পাইতেন না। তিনি একদিন কত মর্ম্ম বেদনার সহিত স্বামীর চরণে

মস্তক রাখিয়া আপনার অভিলাষ জ্ঞাপন মানসে কতই না কি বলিতেছেন, এমন সময় স্বামী মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন যে, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও তিনি আর স্বামীজীর দর্শন পাইলেন না। সাধনাবস্থায় স্বামীজী যখন সমাধিতে থাকিতেন, তখন এক কালে, প্রহর দ্বিপ্রহর এমন কি দুই চারি দিবস পর্য্যন্তও নিস্পন্দভাবে অনিমিষ লোচনে জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু যখন সমাধি ভঙ্গ হইত তাহার পর যে, কখন কোথায় থাকিতেন, কোথায় যাইতেন, কেহ স্থির করিতে পারিত না। কখন বা বর্ত্তমান বাসস্থানের সম্মুখস্থিত ধ্বজার পার্শ্বে সাষ্টাঙ্গ ভূমিসাৎ করিয়া উন্মাদের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, শত সহস্র যাত্রি নানারূপ আহারীয় সামগ্রী, কেহ বা পুষ্প চন্দনাদি, কেহ বা স্বর্ণমুদ্রা কেহ রৌপ্য মুদ্রা কেহ কেহ তাম্রমুদ্রা ইত্যাদি যাহার যাহা ক্ষমতায় কুলাইত, তিনি তাহাই লইয়া গিয়া, স্বামীর চরণপ্রান্তে "ভেট চড়াইয়া" আশীর্ব্বাদ কামনা করিতেন, কিন্তু স্বামীর কামনা শূন্য নেত্রদ্বয় কোন দিকেই লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে আপন জল্পনা ভাবিতেন। কোন কোন দিবস যাত্রির এতই সমাগম হইত, যে, তাঁহার সম্মুখে টাকা পয়সা স্তূপাকারে সংগৃহীত হইত, কিন্তু তখন কেহ নির্দ্দিষ্ট রূপ শিষ্য বা সেবক না থাকায়, পথের দরিদ্র ভিক্ষুকেরা স্বচ্ছন্দে, বিনা আপত্তিতে সে সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া যাইত। তিনি, কিন্তু দাতা কিম্বা

গ্রহীতা ইহার কাহাকেও কিছুই বলিতেন না। এইরূপে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। আমাদের পরিচিত ব্যক্তিটি সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে থাকিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেন এবং নিজের বিষয়-কীট-স্বরূপ জীবনের প্রতি অসংখ্য ধিক্কার প্রদান করিতেন। ক্রমেই তাঁহার সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মে। একদিন রাত্রিতে স্বামীজী, সর্ব্বদা তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ মানসে, অতি দ্রুত পদে নগর অতিক্রম করিয়া, এক সুবৃহৎ প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং প্রান্তরে আসিয়াও যখন দেখিলেন, যে, তিনি কিছুতেই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, নানারূপ তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ের যেরূপ বর্ণনা আমরা আমাদের বন্ধুবরের নিকট শুনিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। "এই দেখিলাম অতি ভীষণ ধূলিরাশী সমস্ত আকাশমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া, ধরণীকে তিমিরাবৃত করিয়া ফেলিল, কোন দিকেই লক্ষ্য হয় না, জগতে যেন একা আমি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল; আবার পর মুহূর্ত্তেই দেখি, অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি, কোথায়ও অন্ধকারের লেশ নাই, পৃথিবী যেন শান্তি সাগরে ভাসিতেছে। আবার একি! দেখিতে দেখিতে দশদিক্ তমসাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, ঘন ঘন বজ্রধ্বনি,

ক্ষণে ক্ষণে অশনিপাত, চপলার তীব্র অথচ চঞ্চলগতি দেখিয়া, বোধ হইল, বুঝি স্বয়ং ভগবান্ রুদ্রদেব সংসার সংহার মানসে, আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, বুঝি মুহূর্ত্ত মধ্যেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণিত হইয়া প্রলয়ের অনন্ত সমুদ্রে মিলিয়া যাইবে।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! পরক্ষণই দেখি, সে ভীষণ দৃশ্য কোথায় অন্তর্হিত হইল, কোন দিকেই ভয়োদ্বেগের চিহ্ন মাত্রও নাই, ধরা যেন শান্তির কোলে বিরাজমানা। যখন এই সমস্ত হৃদয় মন-বিহ্বলকারী ভয়ঙ্কর বিভীষিকা সমস্ত সঙ্ঘটিত হইতেছে, এমন সময় স্বামীজী আমার নিকট হইতে বহুদূরে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। অবশেষে দেখি আমার সম্মুখে এক অতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র মুখব্যাদন করিয়া আমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উপবিষ্ট। এই সমস্ত দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়া, "স্বামীজী রক্ষা করুন্" বলিয়া অতি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন তিনি, হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন," আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" আমি জিজ্ঞাসিলাম "আমার গতি কি হইবে ?" তিনি তিনবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন "এখনও অনেক বিলম্ব।" এই মাত্র বলিয়া তিনি কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন, কত অনুসন্ধান করিলাম, কত কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কোনই উত্তর পাইলাম না ,

অবশেষে ভগ্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিলাম।” একজন বিশ্বস্ত ও অতিপ্রবীণ মহোদয়ের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী সকর্ণে শুনিয়াও যদি এতবড় মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে প্রকৃত একজন জ্ঞানী জ্ঞানে পূজা না করিব, তবে আর কাহার পূজা করিব? সমগ্র ভারতখণ্ডে সাধারণের জ্ঞাত ও গম্য যদি কোন প্রকৃত সিদ্ধ যোগী থাকেন তিনিই সেই মহাপুরুষ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী। স্বামীজী সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার উপযোগী স্থান আমাদের নাই, যদি কখন ঈশ্বর কৃপায় সাধুমহাত্মাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া, স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি, তখন স্বামীজীর সুদীর্ঘ জীবনের অসংখ্য অমানুষী শক্তি বিজৃম্ভিত ঘটনারাশি প্রকাশ করিয়া, হৃদয় মন চরিতার্থ করিব।

এইরূপে, মহাত্মা ত্রৈলঙ্গী, বহুতর তীব্রতম তপস্যা ও অনুষ্ঠানাদি সাধনান্তর, আপনার অভিলষিত স্থানে উপনীত হইয়া, আনন্দে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধাম উজ্জ্বল করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। আহা! তাঁহার সেই প্রশান্ত ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিখানি একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলে, ঘোর নাস্তিকের হৃদয়েও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়। পবিত্র আনন্দ কাননে, কত দিন যে এই মনোহর ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা যায় না, অথচ এখন পর্য্যন্ত সাধুজন লভ্য অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে প্রকৃত মালি ব্যতীত এ ফুলের

মহিমা কে বুঝিবে? জহুরী ভিন্ন মণি মাণিক্য চিনিবে কে? তাই আমাদের ন্যায় অজ্ঞের নিকট এমহারত্নের সুবাদ নাই।

অধিকতর দুঃখের বিষয়, যে, এরূপ মহাত্মাকেও অনেকে নানা বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। অধুনাতন, নব্য বাবুরা, হয়ত সকের ভ্রমণে বাহির হইয়া, ভুল ক্রমেই হউক কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সময় নির্দ্দিষ্ট,—হয়ত, কেবল মাত্র তিন ঘণ্টা কাল কাশীতে অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ মন্তব্য তাঁহার দৈনিক লিপি বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—সুতরাং, সেই সময় মধ্যে সমস্ত কাশী ক্ষেত্রটি দর্শন করা চাই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই ন্যাঙটা স্বামীটাও বাদ না যায় এইরূপ মনে মনে কল্পনাও করা হইয়াছে। এইরূপ বন্দোবস্ত আঁটিয়া, বিলাতি বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া, কাশী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ শেষ হইল। নিরূপিত সময়ের কেবল অর্দ্ধ দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ন্যাঙটা স্বামী দর্শনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া, সেই পাশ্চাত্য মনমোহন অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত দেহে ত্রিভঙ্গ ভাবে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক, বক্র দৃষ্টিতে স্বামীজীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়াই, একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মত প্রকাশ হইল, "যেখানে, লোকে টাকা পয়সা, খাদ্য দ্রব্য এ সমস্ত

দিলেও প্রত্যর্পণ করিতেছেন না, পরন্তু তাহাদের প্রদত্ত পুষ্পমাল্য চন্দনাদি যে যাহা দিতেছে তাহাই, কোন্ আপত্তি না করিয়াই গ্রহণ করিতেছেন, তখন কদাপি ইনি ভাল লোক নহেন, ইহার মনে কোন একটা অভিসন্ধি আছে, অতএব এটা একটা ভণ্ড।" এরূপ অযথা তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। যাহারা এরূপ বিলাতি ভাবাপন্ন ও আত্মাভিমানী তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার বা বুঝাইবার নাই। তবে, যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, সাধু-চরণামৃত পানে যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা লালায়িত, অথচ, পূর্ব্বোক্তরূপ নাস্তিকদের কুহকে পড়িয়া এবং উহাদেরই প্রমুখাৎ বিকৃত বিবরণাদি শুনিয়া, মনে নানারূপ "খটকা" উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই সে ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমরা অদ্য শাস্ত্রের সহিত স্বামীজীর অবস্থা মিলাইয়া প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কি তাহাই বুঝাইব।

যাহারা সিদ্ধপুরুষের প্রকৃত ছবি দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা অষ্টাবক্র সংহিতাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অষ্টাবক্র সংহিতার এক স্থানে আছে।

যদাযৎ কর্ত্তুমায়াতি তদাতৎ কুরুতে ঋজুঃ।
শুভংবাপ্যশুভং বাপিতস্য চেষ্টাহি বালবৎ॥

ভাবার্থ, যদৃচ্ছাক্রমে যাহা যখন উপস্থিত হয় অনভি-সংহিত ভাবে তাহাই করিয়া থাকেন, চাই, উহা সাধারণের

বা নিজের পক্ষে, ভালই হউক আর মন্দই হউক, কারণ তখন তাঁহার (সাধুর) স্তনন্ধয়শিশুর ন্যায় অবস্থা হইয়া থাকে।

আর এক স্থানে আছে,—

জ্ঞঃ সচিন্তোপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োপি নিরিন্দ্রিয়ঃ।

সবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহংকারোনাহংকৃতিঃ।

ভাবার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা হইলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উন্মীলিত দেখিয়া বাহির হইতে বোধ হইতে পারে, যে, তিনি (তত্ত্বজ্ঞানী) বিষয়াদির চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্জগতে নিবেশিত থাকে। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে, কিন্তু সে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অহংভাব (মাখামাখীভাব) নাই। কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, হয়ত তীব্র অধ্যবসায়সম্পন্ন লোকের ন্যায় উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু সে অধ্যবসায়ের সহিত, তাঁহার আত্মার সম্বন্ধ একেবারেই শ্লথ। অনেক সময়, জ্ঞানাভিমানিব্যক্তির ন্যায় অনেক আচরণ করেন, কিন্তু আসলে অহঙ্কার মাত্রই নাই। তাঁহার আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া, কেবল চৈতন্য সত্বায় অবস্থিত। চণ্ডীতেও এই ভাব লক্ষ্য করিয়া, ভগবান্ মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন,—

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্য দৃষ্টয়ঃ।

অর্থ,—কোন প্রাণীরা (যোগীরা) দিবা (অন্তর্জগৎ) এবং রাত্রি (বহির্জগৎ) উভয়েই সমদর্শী হন।

সর্ব্বোপরি, আমাদের শাস্ত্রাদর্শ মহামান্য শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুনুন,—

✱ ✱ উভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যাযতীব লেলাযতীব স যদত্র কিঞ্চিৎ করোতি অনন্বাগতস্তেন ভবতি ✱ ✱।

তিনি একদাই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভযে সমভাবে বিচরণ করিতেছেন, সর্ব্বদাই যেন অন্তরে অন্তরে কোন নিগূঢ় তত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া রহিযাছেন, অথচ বহির্দ্দিকেও ইন্দ্রিযের ক্রিযা চলিতেছে, তিনি বাহিরে সমস্ত কার্য্যই করেন বটে, কিন্তু কোন কার্য্যের সহিতই তাঁহার আসক্তির লেশ মাত্রও নাই।

আবার, স্বযং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায এ সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত না করিযা থাকিতে পারিলাম না। বলিযাছেন,—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি
ইন্দ্রিযাণীন্দ্রিযার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারযন্॥

ভাবার্থ, যিনি তত্ত্ববিৎ এবং সমাহিতচেতাঃ তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শযন, শ্বাস প্রশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মল মূত্রোৎসর্গ, এবং উন্মেষ নিমেষপ্রভৃতি যত প্রকার কার্য্য করেন "তৎসমস্তই কেবল ইন্দ্রিয, মনঃ প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির আপন আপন বিষযের সহিত সংযুক্ত

হইয়া এক একটী ঘটনা বিশেষ মাত্র, তদ্ব্যতীত আর কিছুই না” এইরূপ অবধারণ করতঃ ‘আমার নিজের (আত্মার) কোনই ক্রিয়া নাই” এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যখন শ্রীমান্ অর্জ্জুন সংশয়ান্বিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন,

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষারমব্যক্তং তেষাংকে যোগবিত্তমাঃ॥

অর্থ, যাঁহারা কর্ম্মযোগ তৎপর হইয়া পরাভক্তি সহকারে আপনার এই বিশ্বরূপ আকৃতির উপাসনা করেন তাঁহারাই অধিক যোগ তত্ত্ববিৎ, কিম্বা যাঁহারা নিষ্ঠ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব অবিনাশী এবং বাক্য মনের অগোচর পরমাত্মাতে সমাধি কবিতে পারেন তাঁহারাই অধিক যোগ তত্ত্ববিৎ ?

তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উত্তব প্রদান করেন.

ময্যাবেশ্য মনোযেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মেযুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥
যেত্বক্ষর মনির্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থ মচলং ধ্রুবং॥ ৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ॥ ৪॥

ভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা পরমাত্মায় প্রকৃত স্বরূপে সমাধি করিতে পারেন, তাঁহাদের বিষয় পরে বলিতেছি।

পর্য্যন্ত যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া, আমার এই বিশ্বরূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও আমি যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি (২)। আর যাঁহারা আমার সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়, ও মনোবুদ্ধির অবিষয় সুতরাং অনির্দ্দেশ্য এবং অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপক, প্রকৃতিমধ্যবর্ত্তী, অচল ও নিত্য ক্ষয় ব্যয় রহিত পরমাত্মাবস্থায় সমাধি করিতে পারেন (৩), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকেই সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহারাই যোগী শ্রেষ্ঠ সেই সর্ব্ব-প্রাণী হিতরত মহাত্মনগণ আমাতে (পরমাত্মাতে) মিলাইয়া গিয়া নির্ব্বাণ পদই প্রাপ্ত হইয়া যান (৪)

অতএব বহিরিন্দ্রিয় সংযত করিয়া দেহের সহিত আত্মার মাখামাখি ভাব না ছুটাইয়া দিলে প্রকৃত স্বরূপ বোধ হওয়া একবারেই অসম্ভব। যাঁহারা সাধনা দ্বারা এইরূপে স্বরূপ বোধে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী। যাবতীয় শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানির এইরূপই লক্ষণ করিয়াছেন।

আমাদের স্থানাভাব, সুতরাং আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইহাতেই বোধ করি পাঠকগণ আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা আরও এ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে গীতা খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ন আমরা বুঝিলাম, যে সাধুরা বাহিরে বাহিরে শারীর ধর্ম্মানুসারে কতকগুলি মনুষ্যোচিত কার্য্য করেন বলিয়া, দোষসংশ্লিষ্ট নহেন, কারণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই তৃষ্ণা রহিত।

শাস্ত্র বলেন,—"তৃষ্ণা মাত্রাত্মকোবন্ধ স্তন্নাশোমোক্ষ উচ্যতে।"

অর্থ, আত্মার তৃষ্ণা মাত্রই বন্ধন, ঐ তৃষ্ণার নাশ হইলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঃ সংহিতা।

সুতরাং, মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী শারীর ধর্ম্মানুসারে যে সমস্ত কার্য্য করেন তাহা তিনি সম্পূর্ণ তৃষ্ণা রহিত ভাবেই করিয়া থাকেন। একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া গুলি অবলোকন করিলে এ ভাবটি অতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া সকল পূর্ব্ব হইতেই, যে বেগ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, যতক্ষণ, ঐ সমস্ত ক্রিয়ার একবারে ধ্বংশ সাধন না হইবে, ততক্ষণ উহারা কেন্দ্রাতিগ শক্তির (Centrifugal force) নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেই করিবে। কিন্তু তখন আত্মার সহিত শারীর ক্রিয়ার কোন রূপ সংস্পৃষ্ট ভাব থাকিবে না। আত্মা সম্পূর্ণ নির্লেপ ও নির্ম্মল ভাবে অবস্থিতি করিবেন। তাই বলি, ভাই! সাধু চিনিয়া লওয়া বড শক্ত কথা। মনে করিলেই সাধুর দর্শন লাভ করা যায় না। প্রগাঢ় ভক্তি, ঐকান্তিক অনুরাগ পূর্ণ অধ্যবসায় সহকারে সাধু মহাজন-

গণের পরিসেবা করিলে, যদি তাঁহাদের কৃপা হয়, তবে তাঁহাদের চেনা যাইতে পারে। আবার তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিতে হইলে একবারে তাঁহাদেরই হইয়া যাইতে হয়, হৃদয়, মনঃ প্রাণ কেবল একমাত্র তাঁহাদেরই সেবার জন্য উৎসর্গ করিলে, তবে এক দিন প্রাণের পিপাসা মিটিলেও মিটিতে পারে। নচেৎ, কেবল আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী।

সাধুদিগের জীবন বৃত্তান্ত লেখা বড দুরূহ ব্যাপার, ইচ্ছা থাকিলেও এ আশা পূর্ণ হয না। আশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের পূর্ব্ব আশ্রম সম্বন্ধে সংবাদ লইবার কোনরূপ স্থযোগ পাওযা যায না, কারণ পূর্ব্ব আশ্রম গোপন রাখাই ইহাঁদের শাস্ত্রীয বিধি। জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে অধ্যযনাদি, এবং জীবনের অবশ্য অবলম্বনীয ব্রতাদি পালন পূর্ব্বক আশ্রমত্যাগী সাধু আত্মোৎকর্ষলাভ করেন, তাহা অবশ্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ধর্ম্মপিপাসুর তৎপাঠে প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে, এবং সাধুদিগের আচরিত পথ অনুসরণ করিয়া সাধুজনোচিত প্রকৃতি গঠনে সামর্থ্য হওযা যায। কিন্তু আমরা যাঁহাদের জীবনী লিখিতে অথবা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাঁরা সকলেই আশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসী, স্থতরাং, ইহাঁদের পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলি অবগত হইবার কোনরূপ স্থযোগ পাওযা অসম্ভব। আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দের পূর্ব্ব জীবনের প্রথমাবস্থার সাধনপ্রক্রিয়া জানিবার জন্য বহুতর আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন ফলই প্রাপ্ত হই নাই। তবে ধর্ম্ম

মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী।

পিপাসু হইযা, প্রকৃত অনুরাগের সহিত ঈশ্বর সাধন করিলে মানব যে ইহজীবনেই তাহার উপাদেয ফল উপভোগে সমর্থ হয, এবং চিত্তের সমস্ত মলিনতা ছুটিযা যায়, পূর্ব্ব ও ইহজীবনের সংস্কাররূপ অবর্জ্জনা রাশি ধর্ম্মানুরাগ রূপ বারিধি সলিলে বিধৌত হইযা আত্মার নির্ম্মল সৌরভ বিকাশিত হয়, তাহাই জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইবার জন্য অদ্য আমরা ভাস্করানন্দের বর্ত্তমান অবস্থারই বিষয কিছু আলোচনা করিব। আমাদের ভরসা, বিশ্বাসিগণ মহাত্মার প্রশান্ত আনন্দময মূর্ত্তি দেখিলেই ইহার প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভবে সক্ষম হইবেন।

আমরা অনেক সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিযাছি, কিন্তু এরূপ অহর্নিশি হাস্যআনন কাহারও দেখি নাই। যেন হৃদযমধ্য হইতে আনন্দসমুদ্র উছলিযা উঠিযা আনন পথে নিষ্ক্রান্ত হইযা প্রবাহিত হইতেছে, এবং নযন প্রান্তে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত হইযা অপাঙ্গ দেশ বহিযা পড়িতেছে। এরূপ পবিত্র মুখছবি একবার মাত্র দর্শনেও হৃদয পবিত্র হইয়া যায। শরীর শীর্ণ, কিন্তু ঐ শীর্ণতার মধ্যেও যেন কি এক অপূর্ব্ব কান্তি বিভাসিত হইতেছে, দেখিলেই বোধ হয জরাব্যাধি যেন এ দেহে কখন স্থান পায না। যেরূপ পদ্মাশনে উপবেশন করিযা হস্ত দুইখানি উপর্য্যুপরি ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রায সর্ব্বদাই এইরূপ অবস্থাতেই বসিযা থাকেন। উপবেশন প্রণালী অভিনিবেশ

পূর্ব্বক অবলোকন করিলেই এইটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যেন এই স্থূল দেহটার সহিত আত্মার সম্বন্ধ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু বাহ্যিক ক্রিয়া করেন তাহা কেবল শারীব ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, আত্মার সহিত মাখামাখিভাবে নহে, সুতরাং উহাঁদের কোনরূপ ক্রিয়া ক্রিয়াই নহে। একবার স্বচক্ষে না দেখিলে এভাব উপলব্ধি করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তাহাই আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার তীর্থভ্রমণরূপ মহানুষ্ঠানে বহির্গত হইয়া, এই মহাত্মাদের দর্শন লাভ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেন।

কাশীধামের সন্নিহিত দুর্গাবাড়ীর অতি সন্নিকটে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে এই আনন্দময় মূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজিত। উপবেশন অথবা শরীরের কোনরূপ আস্তরণাদি কিছুই নাই, ভোজনাদি করিবার কোন প্রকার তৈজস পাত্রাদিও নাই, সংক্ষেপে মনুষ্যের একান্ত আবশ্যকীয় কোন সম্বলই তাঁহার নিকট দেখিতে পাইবেন না। কেবল এক খণ্ড ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন মাত্র সম্বল। এই ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি অবলম্বন করিয়া আনন্দবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, আপন মনে আপনধ্যানে নিস্তব্ধভাবে, উপবেশন করিয়া থাকেন। প্রচণ্ড শীতের প্রবল নিপীড়নে অথবা প্রখর সূর্য্যের তীব্র উত্তাপে কিছুতেই কোনরূপ কষ্টানুভব করেন না। যেন কোনরূপ বাহ্যিক ক্রিয়াই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তাঁহার

চিত্ত যেন এ পাপময় সংসার হইতে প্রস্থান করিয়া, কোন লোকাতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথাকার অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া, আপন আনন্দে আপনিই হাসিতেছে। মুখে কেবল প্রেম প্রেম শব্দ। যিনিই কেন উপস্থিত হন না, তিনি যেন সচেতন জীব দেখিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং জীব-মাত্রকেই শক্তিউপহিত চৈতন্য জ্ঞানে প্রেম পরিবর্ত্তনে-লালায়িত হন। পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, "রে ভাই! হামরা সাত্ প্রেম করো গে"?

একদিবস, পৌষ মাসে, অতি প্রত্যুষে প্রাতঃসমীরণ-সেবনে বহির্গত হইয়া, আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া, যাহা দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সমস্ত রাত্র শিশির বিন্দু বৃক্ষের পত্রবাদি সিক্ত করিয়া, শ্যামল দূর্ব্বাদলোপরি নিপতিত হইয়াছে, তদুপরি সেই সামান্য ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি বিস্তীর্ণ করিয়া, স্বামীজী শয়ন করিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে শিশির বিন্দু মুক্তমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। শরীরে কোন আচ্ছাদন নাই, তথাপি সেই নিদারুণ শীতেও কোনরূপই ক্লেশানুভব করিতেছেন না। যেন সেদিকে কোন লক্ষ্যই নাই। আমরা যাইবা-মাত্রই সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আইয়ে, ইহাঁ

বৈঠিয়ে"। কি করি, সেই দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শিশির সিক্ত দূর্ব্বাদলোপরি উপবেশন করিলাম। বসিবামাত্র আমাদের পরিধান বস্ত্র সমস্তই ভিজিয়া গেল; শীত আরও বাড়িতে লাগিল। হৃদমধ্যে গুব গুব্ করিতে লাগিল, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইতে আরম্ভ হইল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী হাসিযা বলিলেন, "কিয়া বাচ্চা, বহুত ঠাণ্ডি হ্যায়; নাই? আচ্ছা তোম ই'য়ে আসনপর্ বৈঠো" এই বলিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি আমাদেব উপবেশনার্থ দিয়া, আপনি সেই উলঙ্গদেহ ভূতলে স্থাপন করিলেন। কোন্ লজ্জায় আর সে আসন গ্রহণ করিব? অপ্রতিভ হইয়া আমরা কোন প্রকারে আপনাকে প্রকৃতস্থ করিয়া স্বামীজীর কথাবার্ত্তায় মনোনিবেশ করিলাম। আমাদের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মহারাজ কাশীনরেশ (কাশীর রাজা) ও বেতিয়াধিপ উভয়ে বহু পারিষদে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামীর দর্শন লালসায় উপস্থিত হইলেন। স্বামী তাঁহাদের দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হে কাশীনরেশ। তোম পহিলে ইয়ে বাঙ্গালী বাবুকে সাত্ প্রেম কিয়ে, ওস্কে বাদ্ হাম্সে বাত্ কর্না। নাহিত হাম্ তোম্ লোগোঁসে কুচ্ নাহি কহেঙ্গে।" মহারাজদ্বয় স্বামীজীর আজ্ঞা শুনিয়া কি করিবেন ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহাবা আমাদের

ন্যায় দরিদ্র বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু স্বামীর আজ্ঞা, কি করেন, অবশেষে দুই চারি কথার দ্বারা আমাদের কথঞ্চিৎ অপ্যায়িত করিলেন। এইরূপে সে দিনকার ব্যাপার শেষ হইল। কিন্তু সেই দিবসাবধি আমরা সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ মানসে গমনাগমন করিতে লাগিলাম। মনে বড়ই ভরসা, এরূপ মহাপুরুষের নিকট যদি কিছু উপদেশ লাভ করিতে পারি, তবে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। প্রত্যহই মনোমধ্যে নানারূপ প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম এবং প্রহরাধিক সময় অতিবাহিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম, কিন্তু কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইত না। স্বামীজী এমনিই ভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিতেন যে, তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাওয়া যাইত না। উপদেশ চাহিলে, তিনি কিরূপ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপ যত্নের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, কেমন ভাবে আত্মীয় স্বজনের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, এই সমস্ত সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে কেবল উপদেশ দিতেন। কোন ধর্ম্ম কথা উত্থাপন করিলে, পাকে চক্রে অন্য কথায় আনিয়া ফেলিতেন। এইরূপ কোন প্রকারেই আশা মিটিল না। অবশেষে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া,

উপস্থিত হইলাম। আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া, স্বামীজী আমার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাচ্চা, কিয়া হুযা? রোতেহো কোঁয়' আমি বলিলাম "অদ্য যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর না পাইলে কিছুতেই এ স্থান পরিত্যাগ করিব না, আমি অনাহারে সমস্ত দিবস বসিয়া থাকিব, আর কাঁদিব। স্বামী আমার কথা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোম পাগল্ হো, তোমকো কিয়া বাতাওয়েঙ্গে? সন্ন্যাসী হোকর সংসারীকো গার্হস্থাশ্রম ছোর্‌কর আউর্ কোই দোসরা উপদেশ দেনা নাঁ চাহিয়ে। যব তোম্ অধিকারী হোগা আপিসে উপদেশ মিল্‌জাগা। তোমকো কুছ্ আয়াস পানে নাহি হোগা। কেবল অধিকারী বন্ যাও। য়াসে তোম হাজারহুঁ কহেনেছি কুছ্ নাই বোলেঙ্গে"।

আমি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। এইরূপ ভাবেই অর্দ্ধদণ্ডকাল অতিবাহিত হইল। স্বামীজী এই সময়টুকু একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সানুগ্রহে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই স্তোত্রটি পাঠ করিতে বলিলেন।

"ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকাঃ
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।

সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মকত্বাৎ,
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্"
ন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্ম্মতম্বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বা,
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলঽহম্।।
ন শুক্লং ন কৃষ্ণং, ন রক্তং, ন পিতং,
ন কুব্জং ন পীনং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘং।
ন রূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ,
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্।।
ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা,
নচ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ।
স্বরূপাববোধো বিকল্পাসহিষ্ণু,
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃকেবলোঽহম্।।"

স্বামীজীর অনুমতি অনুসারে সাগ্রহে স্তোত্রটি পাঠ করিলাম। যতক্ষণ স্তোত্রটি পাঠ করিলাম, ততক্ষণ কোন কিছুই বলিলেন না, যাই আমার স্তোত্রটি পাঠ সমাপ্ত হইল, অমনি বলিলেন "তোমারা দিক্ষা হুয়া ? আমি উত্তর করিলাম ! 'এখন পর্য্যন্তত হয় নাই।

আমি। সাধনা বিহীন এবং অনুষ্ঠান বিহীন মানব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া থাকে এবং সচরাচর সময়ের স্রোতে আপনাকে অনায়াসে ভাসাইয়া দেয়। সুতরাং, সমাজের ও অবস্থা সময়ের বলে পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই জন্য ঋষিরা এবং সাধুরা সময়ের বিকৃত গতিরোধ করিয়া, সমাজকে ধর্ম্মপথে রাখিবার জন্য, সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় করিতে এবং মানবের মনকে সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে গঠিত রাখিতে, শাস্ত্রে নানাভাবে প্রচুর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্নিবার্য্য প্রবল সময় স্রোতে নিপতিত সমাজ, শাস্ত্রের মঙ্গলপ্রদ উপদেশ লক্ষ্য না করিয়া, অবলীলাক্রমে ধ্বংশেরদিকে আপনাদের ছাড়িয়াদিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অবস্থা এতই শোচনীয় যে শতাব্দির অধিক বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে কি না বলিতে সন্দেহ হয়।

বেশী দিন অতীত হয় [illegible] শতাব্দির পূর্ব্বে বাঙ্গালী কেন, প্রায় সমগ্র হিন্দু মা[illegible] জগতে, বলিষ্ঠ দীর্ঘজীবী, স্বাধীনচেতা, কার্য্যক্ষম [illegible] এবং অধিকাংশই অন্তর-র্জগতে অনেক স্থ[illegible] চরমে উঠিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এখন[illegible] দশজন আপনাদের ন্যায় অন্তর্জগতের মহা[illegible]নান রহিয়াছেন। কিন্তু আর দু[illegible] দিন দিনই অধঃপতনের

শেষ সীমায় ধাবিত হইতেছে। মুসলমানের প্রবল নির্যাতনেও বাঙ্গালী অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কি জানি ইংরাজের শিক্ষার, ইংরাজের ব্যবহারের কি মোহিনী শক্তি যে, এই অল্প-কাল মধ্যেই বাঙ্গালাকে চিরধ্বংশের পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে। আপনারা যদি বাঙ্গালার অবস্থা একবার অবলোকন করেন তাহা-হইলে বাঙ্গালাকে একটা জাতি মধ্যে গণ্য করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন; হয়ত তাহাদের বাঙ্গালী বলে চিনিয়াই উঠিতে পারিবেন না। একই জাতি, অথচ পরস্পর বেশ ভূষায় হাব ভাবে এবং প্রকৃতিগত এত পৃথক।

বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দু, হিন্দু, যবন ও ম্লেচ্ছ এই ত্রিবিধ জাতির যৌগিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যবনের আধিপত্য যাবনিক ভাবের বহুল বিস্তারে বহুদিনের জীর্ণ ও জরাগ্রস্থ হিন্দু সমাজের হিন্দুচিত আচার অনুষ্ঠান, যাবনিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া, একরূপ অপরূপ অবস্থা অর্থাৎ যবন-হিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুভাব একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। আবার ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে ম্লেচ্ছোচিত রীতিনীতি, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, আচার ব্যবহার সংমিলিত হইয়া, আবার যবন-হিন্দু, ম্লেচ্ছাচার সম্বৃত যবন-হিন্দুত্বে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুর

অবস্থা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা দেশেই এই অদ্ভুত বিমিশ্রণ কাণ্ড অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু এখন কেবল নামে মাত্র হিন্দু, কিন্তু আচারগত, অনুষ্ঠানগত, প্রকৃতগত স্থূলকথা সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছ-যবনাচার বিশিষ্ট হিন্দুজাতিতে পরিণত। এইত বাঙ্গালার অবস্থা। কিন্তু, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা জানি না, আমেরিকা-বাসী আলকাট নামে জনৈক সাহেব কিছুদিন হইল ভারতবর্ষে আসিয়া এক তুমুল ধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া হিন্দুকে জাতীয় গৌরবে উত্তেজিত করিতেছেন। আর্য্যঋষি-দিগের অদ্ভুত অমানুষী ক্রিয়াকলাপের বিষয় বিজ্ঞান সিদ্ধ এবং যোগবলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, সর্ব্বসমক্ষে ঋষিদিগের অসীম গুণানুকীর্ত্তন ও জয় ঘোষণা করিতে-ছেন। বর্ত্তমান সময়ের বিপথগামী আর্য্য সন্তানদিগকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়া, নিজ মর্য্যাদা, নিজ গৌরব এবং পিতৃপুরুষদিগের পথ স্মরণ করাইয়া, পুনরায় আর্য্য আচরিত পথে বিচরণে যুক্তি দেখাইয়া মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। একজন বিদেশী ম্লেচ্ছের মুখে আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের গৌরব বার্ত্তা এবং অমানুষী ক্ষমতা এবং তাঁহাদের বিশুদ্ধ সভ্যতার বিষয় শ্রবণ করিয়া অনেকের মন ফিরিয়াছে, শাস্ত্রের

উপদেশ লাভ করিতে চিত্ত কতক পরিমাণে ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাঁহাদের মনের সঙ্গে সঙ্গেইত এই এতদিনের কুআচরণের সংস্কার রাশিত নষ্ট হয় নাই, মনের সে তামসিক আবরণ অপসৃত হয় নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে চিত্ত কেবল অন্ধকারে ঘুরিতেছে। কিন্তু ম্লেচ্ছশিক্ষার একমাত্র উপার্জ্জিত সম্পত্তি যে আত্মাভিমান সে টুকু হারায় নাই। সেই আত্মাভিমানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, শাস্ত্রের অতি গূঢ় রহস্যও বুঝিতে প্রয়াস পায়, সে সমস্ত বুঝিবার সম্বল টুকু হারাইয়া বসিয়া আছে। তাই বুঝুক আর নাই বুঝুক বড় বড় বিষয়ের আলোচনায় ব্যতিব্যস্ত। ইহাতে আত্মাভিমানটা দিন দিন বাড়িতেছে মাত্র। কিন্তু কে কাহার কথা শুনিবে?

স্বামীজী। আপনি যাহা বলিলেন তাহা বড়ই সত্য। কেবল বাঙ্গালা দেশেই যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা নহে। ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রায় এইরূপ দেখা যায়। আমাদের আশ্রমের নিয়মানুসারে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণে বিধি আছে, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বদেশেই আমাদের যাইতে হয়। অধুনা হিন্দু সমাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে ভাবিলে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানে সন্ন্যাসী বলিয়া বহু সমাদরে আদৃত হইয়াছি, সেই সমস্ত স্থানেই

আবার এখন সন্ন্যাসী মাত্রকেই ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। সে প্রকার রুচিই যেন আর নাই। যে দেশে সাধু সজ্জনগণ সম্যক্ সম্মানিত না হন সে দেশের ধ্বংশ অতি সন্নিকট। আর যে আপনি কর্ণেল আলকাটের কথা বলিলেন, ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট কিছু দিন অতীত হইল আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হয়। তাহাতে আমি অনেক নূতন নূতন গাথা শুনিতে পাইয়াছি। বাঙ্গালা দেশে এই আলকাট সাহেবের চেলা কিরূপ বাড়িতেছে?

আমি। প্রথমে যখন আলকাট সাহেব ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়া ছিলেন এবং দলে দলে আলকাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। বাঙ্গালীর সকল কার্য্যেরই গতি এইরূপ। কিন্তু সাহেবের উদ্যম কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। আমাদের উভয়ের এইরূপ বার্ত্তালাপ হইতেছে, এই সময় একজন ভদ্র বেশধারী হিন্দুস্থানী উপস্থিত হইয়া বন্দনা পূর্ব্বক বলিলেন, "স্বামীজী মহারাজ! রাণি মা আপনাকে প্রণাম জানাইয়া আপনার শারীরিক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

স্বামীজী। রাণি মাইকো হামারা আশীর্ব্বাদ দেকর কহো (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) ইয়ে বাঙ্গালী বাবু হামারা বড়ে প্রেমিক হ্যায়, রাণিজীকোভি ইয়ে বাঙ্গালীকে সাৎ প্রেমকরনে হোগা।"

আগন্তুক পুনরায় বন্দনা করিয়া এই সংবাদ লইয়া চলিয়া গেল। আমি স্বামীজীর অদ্ভুতরূপ বাক্য শুনিয়া অবাক হইলাম। মনে মনে বলিলাম যে রাণিমা না জানি স্বামীজীর একথা শুনিয়া কতই লজ্জিত হইবেন। একজন রাজপরিবারস্থ স্ত্রীলোককে বলা হইল "বাঙ্গালীকে সাৎ প্রেম" করিতে হইবে। আমাদের পাপ মন, তাহাই বক্র ভাবই মনে আসিল; কিন্তু স্বামীজী অকপট ও নির্ভীক হৃদয়ে কেমন মধুমাখা ভাবে অনুরাগের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। পবিত্র বাক্যের পবিত্র ব্যবহার দেখিয়া হৃদয়ের কত আনন্দ হইল। অন্ন হতভাগ্য বাঙ্গালী এই "প্রেম" শব্দের কি অপব্যবহারই করিয়া থাকে। আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় স্বামী বলিতে লাগিলেন,—ইহাঁকে (রাণিকে আপনি জানেন না। ইনি দক্ষিণ দেশের শ্রী—রাজার স্ত্রী, এখন বিধবা, ধার্ম্মিকা, আলাপে বড়ই সুখী হইবেন। রাণিমা প্রায়ই আমার নিকট আসিয়া থাকেন; সুতরাং

আপনার সহিতও একদিন দেখা হইবে। স্বামীর কথা শেষ হইবামাত্র একজন দীনবেশধারী অতি শান্তমূর্ত্তি হিন্দুস্থানী আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি স্বামীজী আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবু! এই ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রেমিক। ইহাঁর সহিত "বহুৎ বহুৎ" প্রেম করিতে হইবে। সাধনাবস্থায় আমার এই ব্যক্তিই অতীব অনুরাগের সহিত আমার নানারূপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন। উনি আমার ধর্ম্ম পথের পরম সহায়, সুতরাং আমার পরম মিত্র। অভ্যাগত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে, কিছু অপ্রতিভ, হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সজল নয়নে স্বামীজীর প্রতি অবলোকন করিয়া নিজ জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। স্বামীজী! এই ত হিন্দু সমাজের অবস্থা, এ অবস্থায় কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব? এখনইত একরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং আত্মজ্ঞান কি উপায়ে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি তাহার উপায় বলিয়া না দিলে আমাদের ন্যায় অগতির গতি নাই।

স্বামীজীর সকল কথাতেই হাসি, হাসিয়া বলিলেন,—ভয় নাই, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ লাভ ও সাধু গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভে যত্নশীল হও।

চিত্তের একাগ্রতা হইলে সমস্তই সম্ভব জানিবে। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যোগীই বল, পরমহংসই বল, সকলকেই প্রথমে সাধুসঙ্গরূপ পবিত্র সেতু পার হইতে হইয়াছে। সাধুর বেশধারী অভ্যাগত ব্যক্তিমাত্রকেই সাদরে সৎকার করিবে। অনেক ভণ্ড সাধুবেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সুতরাং সাবধানের সহিত সাধুবেশধারী পথিকগণকে সৎকার করা কর্ত্তব্য; ভণ্ড সন্দেহ করিয়া অতিথি সৎকারে বিরত হইও না। যদি কখন ভণ্ডের দ্বারা বঞ্চিত ও হও তথাপিও অতিথি সৎকারে বিরত হইবে না; কারণ, সাধুভক্তি থাকিলে একদিন না একদিন তোমার গৃহে প্রকৃত সাধুর সমাগম হইতে পারিবে। কিন্তু তুমি যদি সাধুবেশধারী মাত্রকেই ভণ্ড বলিয়া তাড়াইয়া দাও, তবে, হয়ত একদিন প্রকৃত সাধুকেও চিনিতে না পারিয়া ভণ্ড জ্ঞানে বিদরিত করিবে। সাধুদিগের সঙ্গে ক্ষণকাল সহবাস না করিলে কিছুতেই তাঁহাদের চিনিতে পারা যায় না। তাই বলিলাম, সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই যথাসাধ্য, সৎকার করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করিবে। যদি তোমার অকপট সেবা দ্বারা এইরূপ অজ্ঞাত ভাবেও কোন একজন প্রকৃত সাধুর সন্তোষভাজন হইতে পার তবে হইলে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। বহু

জন্ম তপস্যার দ্বারাও তুমি যাহা না করিতে পারিবে সাধুর কৃপা হইলে স্বল্প কাল মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং সাধু সেবায় কদাপি অবহেলা করিও না।

সাধু সহবাসের মাহাত্ম্য আমি একমুখে বর্ণন করিতে অক্ষম। একমাত্র সাধু সহবাসে পশুও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। সেই জন্য ঋষিগণ শাস্ত্রে নানাভাবে সাধু সহবাস এবং সাধুদিগের আচরিত পথের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই অধর্ম্ম প্রধান কলিযুগে দুর্ব্বল মানবের বহির্ম্মুখীন বৃত্তির আধিক্য বশতঃ চিত্তের একাগ্রতা লাভ একরূপ অসম্ভব। শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে, দুর্দ্দমনীয় বৃত্তিসকলকে নিরোধ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে। (প্রাণাদিবৃত্তি, মানসবৃত্তি, অভিমান বৃত্তি, বুদ্ধি-বৃত্তি, প্রকৃতি-বৃত্তি এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি নিরোধ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করার নাম প্রকৃতিবৃত্তি নিরোধ) সুতরাং এরূপ কঠোরতম তপস্যা এ কলিযুগে সাধনবিহীন সাংসারিক ব্যক্তির একান্ত অসম্ভব। কিন্তু এক সাধু সহবাস দ্বারা সাধু মাহাত্ম্যে ক্রমে সকল প্রকার নিরোধশক্তি আপনাপনি উপস্থিত হইতে থাকে, এবং সময়ে ঈপ্সিত ফল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। শাস্ত্রও বারম্বার এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আমি। সাধুবেশধারী দেখিলেই, কি তাহাকে সাধু জ্ঞানে পূজা করিব? তাহাতে কি ভণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না?

স্বামী। যদি পার, সাধুর লক্ষণ দেখিয়া সাধু চিনিতে শিক্ষা করিবে। শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে সাধুর লক্ষণ বর্ণিত রহিয়াছে। অদ্য আমি তাহারই কথঞ্চিৎ আপনাকে বলিব।*

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।

* এই খানে বলিয়া রাখা উচিৎ যে, আমরা যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, স্বামীজী যে ঠিক এই সমস্তই বলিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি কোন শ্লোকের এক চরণ, কোনটার বা অর্দ্ধ চরণ মাত্র উল্লেখ করিতেন। আমরা পাঠকগণের বোধ গম্যের জন্য শ্লোক গুলি সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করিলাম।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

এইরূপ ব্যক্তিকেই সাধু বলিয়া জানিবে। এবং যথা সাধ্য ইহাঁদেরই সহবাসে থাকিয়া উপদেশ লাভ করিবে।

আমি। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনার কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়াছি। এতদিনে আমার কাশী আগমন সার্থক হইল। এতদিন ধরিয়া আপনার উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া একটি ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন তবে প্রকাশ করি।

স্বামী। ভীত হইবার কোন কারণই নাই, নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমাদের নিকট ভয়ের কারণ কি আছে?

আমি। আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যদি কৃপা করিয়া দীনের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহা হইলে ঘোর পাপার্ণবে নিমজ্জমান একটি প্রাণির উদ্ধার করা হয়।

স্বামী। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে আপনার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমি প্রকৃত পক্ষে অক্ষম। আমাদের আশ্রমের রীতি অনুসারে এরূপ

দীক্ষার বিশেষ নিষেধ আছে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি, আপনি কখন ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য মানুষের নিকট উপযাচক হইবেন না। বিশ্বেশ্বরকে আপন ভাষায় আপন ভাবে কাতর হৃদয়ে প্রাণের সমস্ত ভিক্ষা জানাইবেন, তিনি সদ্গুরুর আশ্রয় দেখাইয়া দিবেন। তিনিই সকল স্থানে থাকিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আপনারও গুরু তিনিই মিলাইয়া দিবেন, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় অন্ধকার হইয়া আসিল। তখন আমি ভগ্নমনে স্বামীজীর নিকট ধীরে ধীরে বিদায় লইলাম। আমি যখন আনন্দবাগ পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাকুণ্ডর উত্তর প্রান্তে আসিলাম, পথিমধ্যে কাষায় বস্ত্রধারী একজন দণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনিও প্রায়ই স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তাঁহাকে পাইয়া আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া তাঁহাকে আমার সহিত সহর মধ্যে আসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অতি বিনীত ও স্নেহ পরায়ণ; সুতরাং আমার অনুরোধে অবহেলা না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার অনুসরণ করিলেন। পরে নানা কথাবার্ত্তার পর স্বামীজীর বিষয় উত্থাপিত হইল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বামীজীর কঠোর সাধনার বিষয় বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া-ছিলাম। যখন কেবল আমার অষ্টাদশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম তখন আমি ৺ কাশীধামে আসিয়া বাস করিতে থাকি। সে সময় ইনি সর্ব্বদাই গঙ্গাতীরে থাকিতেন। যেরূপ ভাবে থাকিলে জীব মাত্রেরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভব সেইরূপই থাকিতে ভাল' বাসিতেন। তীব্র শীতের সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপরে ঠিক এক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায ভাসিয়া বেড়াইতে,বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। এইরূপ অতি বিস্ময়কর ও অতীব কষ্টসাধ্য কঠোরতা করিয়া সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতেন। কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। আপন মনে কখন হাঁসিতেন কখন বা কাঁদিতেন। 'সে সময় তাঁহাকে কেহ কোনরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোন আহারীয় সামগ্রী নিকটে যাইয়া ধরিতেন; তিনি দ্রব্য গুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় সর্ব্বদাই সমাধিস্থ থাকিতেন। বহুদিন যাবৎ এইরূপ অতিবাহিত হইলে ক্রমে যেন একটু একটু করিয়া বাহিরের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। সময়ে

সময়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন, এবং মধ্যে মধ্যে দুর্গাবাড়ীতে মায়ের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। তৎপর এই আনন্দ বাগে আশ্রয় লয়েন এবং সেই অবধি এই খানেই অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকেন।"

তিনি আরও বলিলেন, আমি শুনিয়াছি ইনি পঞ্জাব দেশবাসী, ইহাঁর অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান হয়। এইরূপে কিছু দিন নিষ্কণ্টকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আনন্দ মনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার অর্থ-লিপ্সা একবারেই নাই। সেদিবস একটি অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ দেশস্থ বড়ার রাণী বহু দিবস হইতে যথেষ্ট ভক্তি সহকারে ইহার সেবা করিতেন। এমন সময় হঠাৎ সেই রাণির একটি অতি-বিষম মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। স্বামীজীর আশীর্ব্বাদে তিনি সে মোকর্দ্দমায় জয় লাভ করেন। রাণিমাই সেই জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া একদিবস স্বামীজীর নিকট নগদ দুই লক্ষ টাকা লইয়া উপহার প্রদান করেন। স্বামীজী হাসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন আমি উহা লইয়া কি করিব, এই মুহূর্ত্তে এসমস্ত আমার নিকট হইতে লইয়া যাও, যদি ইচ্ছা হয় এই টাকা দ্বারা কাশীতে কোন সদনুষ্ঠান কর। রাণিমা তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বামীজীর উপদেশ মত একটি অতিথিশালা একটি

মঠ ও স্বামীজীর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন সংকল্প করিলেন। এই বলিয়া দণ্ডী স্বামী উচ্চৈস্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন "ধন্য স্বামীজী ধন্য!। (আমরা শুনিলাম যে সেই রাণী ইহার মধ্যেই স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কাশীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং মঠ ও অতিথিশালা প্রায় শেষ হইল।)

দণ্ডীর নিকট হইতে স্বামীজীর পূর্ব্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিতে আসিয়া শুনিলাম পরদিনই আমাকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কাশীত্যাগ করিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বরাবর স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। যথাবিধি প্রণামান্তর গত রাত্রির ঘটনা বলিলাম। তিনি উত্তরে একটু হাস্য করিলেন মাত্র। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই দিবসই ভগ্ন হৃদয়ে কাশী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

ভক্তকুল চূড়ামণি মহাত্মা নারদ ভক্তিব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমেই বলিতেছেন ভক্তি কিরূপ? "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা অমৃত স্বরূপা চ। যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধোভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্য ন কিং চিদ্বাংঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি। যদ্‌জ্ঞাত্বামত্তোভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি। অর্থ,—ভগবানে পরম প্রেম স্বরূপা ও অমৃত স্বরূপা যে ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পরম তৃপ্ত হইয়া যায়। যাহা পাইলে মনুষ্যের চিত্তের আকাঙ্ক্ষা, শোক, দ্বেষ যাবতীয় বস্তুতে রতি ও উৎসাহ বিলীন হইয়া যায়। যে জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য উন্মত্ত হয়, স্তব্ধ হইয়া যায় এবং আত্মারাম হয়।

এইরূপে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বয়ং ভক্তাদর্শ নারদ বলিলেন "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপং; মূকাস্বাদনবৎ, প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে"।

যখন দেবর্ষি নারদই এই কথা বলিলেন তখন আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তির ভক্তি কথা লইয়া আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সাধু মুখে শুনিয়াছি, যে সকল কথাই শাস্ত্র সম্মত বলিতে পার

মৃত মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস।

আর নাইপার সাধু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সাধ্যমত সদভিপ্রায়ে তাহা লইয়া আলোচনা করিবে। তাহাতেও আত্মার কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

অনাদি কাল হইতেই সাধু ভক্তগণ, জগতের কল্যাণ কামনায় ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই মহা তত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সকল সাধুভক্তগণ উন্মত্ত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছেন "অনির্ব্বচনীয়ম্। কুমার (সনকাদি) বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শাণ্ডিল্য গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য শেষ, উদ্ধব আরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণাদি ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ কত ভাবে কত প্রকারে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিলেন কিন্তু ভক্তি সুধা পানে জগৎ মাতিল কৈ? বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নূতন কথা নাই নূতন ভাব নাই কেবল আচার্য্যদিগের উক্তির চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। আরে পাগল! ভক্তি কি ব্যাখ্যার জিনিষ, না মুখে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায়। যদি ভক্তি রত্ন লাভ করিতে চাও তবে সূত্র ব্যাখ্যা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভক্তের নিত্য সহচর হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হও, ভক্তের অমৃতময়ী লীলা শ্রবণ কর, ভক্তের দাসানুদাস হইয়া তাঁহাদেরই কার্য্যে আত্ম সমর্পণ কর। যখন স্বয়ং নারদ ঋষিই ভক্তি ব্যাখ্যায় অক্ষম তখন

তুমি আমি তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করি কোন সাহসে? দেবর্ষি নারদ ভক্তি সূত্র লিখিয়া জগতের অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন, না সুর-লয়-তাল সংযুক্ত বীণার মৃদু মধুর ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণ গান করিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া, দ্বারে দ্বারে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন, তাহার দ্বারা জগতের অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন? আমরা বলি নারদ কৃত লক্ষ লক্ষ ভক্তি সূত্রে যাহা না করিয়াছে নারদের সেই নৃত্যে বীণার ঝঙ্কার সহ একবার হরিনামোচ্চারণে তাহার সহস্রাধিক মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। সে বীণার ঝঙ্কার সে নৃত্য হরি নামোচ্চারণ অদ্যাবধি ভক্তের সুবিমল কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

ভগবান্ শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণ করিতে গিয়া বলিলেন ;—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

আমি মূঢ়, আমার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন ; আমি পরানুরক্তি বলিলে কিছুই বুঝিলাম না। আমি যেমন "ভক্তি" ও বুঝি না সেইরূপ "পরানুরক্তিরীশ্বরে" ও বুঝি না। সুতরাং আমার ন্যায় অজ্ঞানীর পক্ষে ভক্তি সূত্র

কোন কার্য্যেই আসিল না। কিন্তু যখন শুনিলাম ভক্তকুলরবি হরিদাস কাজি কর্ত্তৃক নিষ্ঠুররূপে প্রহারিত হইয়াও ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে অটল অথচ নির্ভীক হৃদয়ে হরিপাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। কাজির প্রহরীগণ ভীষণরূপে প্রহার করিতে করিতে সমস্ত গ্রাম বেষ্টন করাইয়া লইয়া ফিরিতেছে। আপাদ মস্তক রুধিরে প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্তাক্ত কলেবরে হরিদাস কোন আপত্তিই না করিয়া প্রহরী-দের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন আর মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন। সে ধ্বনি, গ্রাম, প্রান্তর কাঁপাইয়া গ্রামবাসীর কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। এই অলৌকিক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দর্শক বৃন্দের বক্ষঃ ভাসাইয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে হৃদয় খুলিয়া ডাকি-তেছে "কোথায় ভক্তের প্রভু তোমার প্রিয় পুত্র হরিদাস কে আজ রক্ষা কর। এইরূপে ঘোর পরীক্ষায় হরিদাস উত্তীর্ণ হইলেন। হরিদাসের জয় হইল। ভক্তের সখা ভক্তের সমস্ত কষ্ট নিজে বুক পাতিয়া সহ্য করিলেন। তখন আমার ন্যায় মূঢ়ের জ্ঞান জন্মিল। আমি ভক্ত হরিদাসের এইঅদ্ভুত চরিত্রে যাহা বুঝিলাম, সহস্র সূত্র পড়িয়াও তাহা বুঝিতে পারি না। আহা! পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব! সরল নিষ্পাপ হৃদয়,

সংসারের কুটিলতা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ধ্রুব মাতা সুনীতির বাক্যে ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া ছুটিল,—অরণ্য প্রান্তর, পর্ব্বত গহ্বর, নদ নদী, কিছুরই প্রতি লক্ষ্য নাই,—ধ্রুবের ধ্রুব বিশ্বাস পদ্মপলাশলোচন হরিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন। আহা! বিশ্বাসী ভক্তের কি মহিমা! অরণ্যের হিংস্র জন্তুও আজ নিজ হিংসাবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া বাৎসল্য ভাবে দৌড়িয়া গিয়া ভগবদ্ভক্তের পদলেহন করিতেছে। ধ্রুবের কণ্ঠধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত গমন করিতেছে ততদূরস্থ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সমস্তই সেই ভক্তের কণ্ঠ নিঃসৃত হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে একমাত্র বিশ্বাসের বলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভীক শিশু জয়লাভ করিল। পদ্মপলাশলোচন দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিল। তখন ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত করিয়া শব্দিত হইল "জয় বিশ্বাসীর জয়"। আবার ঐ দেখুন দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ! পিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ করিয়া হরির জন্য সকল যন্ত্রনা অক্লেশে সহ্য করিতেছে। কখন বা উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, কখন জ্বলন্ত বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কখন অতলস্পর্শী অসীম সমুদ্রে ভাসিতেছেন। কিছুতেই ভক্তের চিত্ত বিচলিত নহে। প্রহ্লাদ অচল অটল হৃদয়ে হরির শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান

নিমগ্ন। নির্ম্মম পিতা সন্তান বধের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই হরিভক্তের অনিষ্ট করিতে পারিলনা। প্রহ্লাদ বীরের ন্যায় সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিলেন। বিপদের কাণ্ডারী হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। হরিদাস ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সকলেই শাস্ত্র সম্বন্ধে "নিরক্ষর" বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আজীবন শাস্ত্র চর্চ্চায়ও যাহা লাভ করিতে পারিল না ভক্ত একবারমাত্র সকরুণ আহ্বানে তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তাই বলি ভগবান্ ভক্তের নিকট বিদ্যা, জ্ঞান চাননা, তিনি বলেন, "(ভক্ত) ভক্তি-ভরে ডাক্‌লে পরে, আমি তারই হ'য়ে র'ই; আবহমানকাল হইতেই সকল স্থানেই ভক্তেরই জয় হইয়া আসিতেছে এবং সাংসারীক জীব সেই ভক্ত চরিতের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এমনকি ভক্তেরই জন্য স্বয়ং ভগবানকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে হয়।

যখনই পৃথিবী পাপ ভারে অবসন্ন হন তখনই ভগবানের আবির্ভাব না হইলে এই অনন্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং, সময়ে সময়ে ভগবান্ হরি স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে সৃষ্টি রক্ষার জন্য উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাকে অবতীর্ণ করায় কে? পাপীষ্ঠ

তাঁহাকে চায় না, সুতরাং পায়ও না। তিনি বলিয়াছেন।

যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

সুতরাং যে যাহাচাহে কল্পতরু হরি তৎক্ষাৎ তাহাই তাহাকে দিযা থাকেন। আমি পাপী আমার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য সর্ব্বদা আমি তাঁহার নিকট লালায়িত, তাহাই আমি দিন দিন পাপের ঘোর নরকে নিপতিত হইতেছি। তামস শক্তিতে আমার অন্তর বাহির অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তামসিক শক্তির গুণ সংহার করণ; তামসের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলে ধ্বংসের কার্য্যও সন্নিকট হইবে। অতএব একমাত্র সত্ত্বের আশ্রয় ভিন্ন সৃষ্টি রক্ষার উপায় নাই। কারণ, সত্ত্বের বলেই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড রক্ষিত ও পালিত হইতেছে। হরিই পূর্ণ মাত্রায় সত্ত্বের আধার। সুতরাং, পৃথিবী যখন পাপীর ক্রিড়া ভূমি হয় তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি ভিন্ন আর রক্ষা কর্ত্তা কেহই নাই। কিন্তু হরি যে ভক্তের অধীন। সমপ্রকৃতিক শক্তি ভিন্নত পরস্পরে আকর্ষিত হয় না। ভক্ত যেখানে নাই হরি সেখানে থাকিয়াও থাকেন না। তাহাই যখনই পৃথিবীর পাপ-ভারহরণ করিবার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তৎপূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তগণ আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ভক্তবৎসল হরি সেই সাত্ত্বিক ভক্তগণের আকর্ষণ বলে তাঁহাদের

রক্ষার্থ মর্ত্তালোকে আসিয়া অবতীর্ণ হন। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যতই ভারতে সাধু ভক্তের অভাব পরিলক্ষিত হইবে ততই বুঝিতে হইবে পূণ্য ভূমি ভারত বর্ষের শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্ত বড়ই অবশ হইয়া পরে, হৃদয়ে শান্তি থাকে না। কিন্তু এই নিরাশার ঘোর অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢের ন্যায যখন ভাবিতে থাকি তখন সুদূরে আশার দুই একটি ক্ষীণালোক দেখিতে পাই। দেখিতেপাই ভারত জননি এখনও প্রাতঃস্মরনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাচরণ, রমানন্দ, ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির ন্যায় কৃতিপুত্র প্রসব করিতেছেন। আহা! আজ আমরা যে মহাত্মার জীবন চরিত লিখিতে সংকল্প করিয়াছে এইরূপ ভক্তের সংখ্যা যদি ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে কি এই সোণার ভারতের এ দুর্দ্দশা থাকিত। কখনই না।

রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলায় হারাইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাস করেননাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি একেবারে "নিরক্ষর" ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ

ভগবদ্ভক্ত জন্ম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াগিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহানুভব ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন রামকৃষ্ণের অমানুষী ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছেন। আমরা যথাজ্ঞান সংক্ষেপে পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিব।

পরমহংসের বাল্যাবস্থা।

হুগলী জেলার অধীনে শ্রীপুর কামারপুকুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শুনা যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতিশয় অমায়িক, দয়ালু ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং অনুরাগের সহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানও করিতেন। সাধু পিতা না হইলে সৎ পুত্র জন্মাইতে পারে না। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রকৃতি দিন দিন এত উন্নত হইতে থাকে, যে, শেষ অবস্থায় তিনি প্রকৃত তপস্বী হইয়া উঠেন এবং ভগবানের কৃপায়

নিজ পরিশ্রমের ফলও প্রাপ্ত হন। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী সকল লোকেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিত। শুনা যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন গ্রামবাসী কেহই তাহাতে স্নান করিতে সাহস করিত না। এমনিই তাঁহার উপস্তেজের প্রভাব ছিল। চট্টোপাধ্যায়মহাশয়ের স্ত্রীও স্বামীর অনুরূপই ছিলেন। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিনটী পুত্র জন্মে। মধ্যমের নাম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৭৫৬ শকের ১০ই ফাল্গুন শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। শুনা যায় রামকৃষ্ণের জন্ম কালীন অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিয়া এস্থলে সে সমস্ত সন্নিবেশিত করিতে বিরত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রামবাসী সকলেই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে পরম ভক্তি করিত, সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক অতি সুন্দর পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া দলে দলে প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সূতিকাগৃহ বেষ্টন করিয়া মহানন্দে হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। বহির্বাটিতে প্রতিবাসী ভদ্রাভদ্র সকল লোকই একত্রিত হইয়া নব প্রসূত সন্তানের লগ্ন গণনায় ব্যস্ত হইয়া নানারূপ বিচার

করিতে লাগিলেন। সন্তান অতি, সুলগ্নে জন্মিয়াছে দেখিয়া পরম ধার্ম্মিক পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গণনায় যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আনন্দ আরও শতাধিক বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সাহস করিয়া কাহাকেও নিজ গণনার ফল বলিলেন না। নবজাত শিশু শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই। মাতা আদর করিয়া সন্তানের নাম রাখিলেন "গদাই"। গদাইয়ের সর্ব্বদা হাস্য বদন। কদাচিৎ কেহ কখন গদাইকে কাঁদিতে দেখিয়াছিল। ক্রমে অন্নপ্রাশনাদি শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন মাতার আদরের গদাইয়ের নাম করণ হইল রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণের যতই বয়ঃবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহার প্রকৃতির নির্ম্মলতা ও সাধু জনোচিত ব্যবহারে সকলে বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান, কেহ তাঁহাকে কখন তাড়না করিতে সাহস করিত না, লেখা পড়ার জন্যও বড় বেশী জোর করা হইত না। তিনি আপন মনে আপন ভাবে সর্ব্বদা খেলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বাল্যক্রীড়া অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার সমবয়স্ক বালক বালিকাদের লইয়া অতি নির্জ্জন প্রান্তরে যাইয়া নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং বয়স্যের মধ্যে কাহাকে শ্রীদ

কাহাকে সুবল কোন বালিকাকে গোপীকা প্রভৃতি সাজা ইয়া বড়ই সরল উচ্ছ্বাসের সহিত বাল্যলীলা করিতেন। এতই সুন্দররূপে কৃষ্ণলীলা করিতেন, যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার লীলাভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইতেন। বৃন্দাবনের গোকুলবিহারী এমনিই সুন্দররূপে অভিনয় করিতেন যে বয়ঃবৃদ্ধি জ্ঞানীরও তাহা অসাধ্য বলিয়া বোধহইত। তাঁহার বাল্য লীলার ভাব দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যে তিনি পূর্ব্ব জন্মে একজন অতি উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। এবং সেই সমস্ত সাধনার সংস্কার রাশি যেন বাল্য জীবনেই উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুরিত হইতেছে।

মানুষ সংস্কারের দাস। কারণ, কেবল মাত্র অসংখ্য সংস্কার রাশির উপরেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অবস্থিত।

নসদুৎ পাদোনৃশৃঙ্গবৎ," নাশঃ কাকা লয়ঃ ॥

সাংখ্য দর্শন।

যাহা নাই তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারেনা, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্য ভাবে বিনষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং, আমরা যাহা কিছু করি তাহার কোনটীই একবারে নূতন নহে। আমাতে যে অসংখ্য সংস্কার রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে উহারা যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পায় তখনই পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইয়া উঠে মাত্র। আমরা এখন যাহা কিছু করি

তাহা, পূর্ব্বে যাহাকিছু করিয়া আসিয়াছিলাম তাহারই স্ফূর্ত্তি বিশেষ মাত্র। আবার এখন যাহা করিতেছি পরকালে সেই সমস্তেরই স্ফূর্ত্তি পাইবে মাত্র। কেহ নূতন কিছু আনিও নাই এবং নূতন কিছু লইয়া যাইব না। এইরূপে যদি সর্ব্বদা সংস্কারের ক্রিয়া না হইত তাহা হইলে এই অনন্ত সৃষ্টিই সম্ভাবিত না। প্রত্যেক মনুষ্যই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের বলে নিজ অবস্থা গঠন করিয়া লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় পতিত হন তাহা তাঁহার নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আবার পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত সংস্কার অধিক বদ্ধমূল হয় পরজন্মে প্রারম্ভ হইতেই সেই সমস্ত সংস্কারের ক্রিয়া অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল বালক শৈশব কাল হইতেই নানা সদগুণে অলঙ্কৃত হয় তাহা কেবল তাহাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের বলে মাত্র। এইরূপ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বলেই ধ্রুব প্রহ্লাদ, নারদ শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মা আজন্ম হরিপরায়ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণেরও বাল্যজীবনের ঘটনাবলি ও ব্যবহার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি পূর্ব্ব জন্ম হইতে নানাবিধ সুসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সামান্য আহার ও সামান্য-রূপ পরিধেয় বস্ত্রেতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। আশৈশব তাহার কোনরূপ আড়ম্বর ভাল লাগিত না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও গীত বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিনা সহায়তায় কেবল মাত্র নিজের চেষ্টায় তিনি সুন্দর রূপে নৃত্য গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাহার কণ্ঠস্বর এতই সুমধুর ছিল যে তাহার গান শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহের সহিত সর্ব্বদা তাঁহাকে শ্যামা বিষয়ে গান করিতে অনুরোধ করিতেন। রামকৃষ্ণের কখন গানে অরুচি ছিল না। কি ভদ্র কি অভদ্র যে অবস্থার লোক হউন না কেন গান শুনিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে গান করিতেন। এবং গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার "শ্রোতার" দিকে বড় দৃষ্টি থাকিত না, তিনি আপন গানে আপনি মোহিত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। রামকৃষ্ণের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ এই ছিল যে তিনি সকল অবস্থার লোককেই সন্তুষ্ট করিয়া পরম সুখানুভব করিতেন।

এইরূপে সদানন্দে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়া যখন প্রায় ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন তখন তাঁহাকে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতায় ঝামাপুকুর নামক স্থানে

একখানি চতুষ্পাঠী ছিল। রামকৃষ্ণ সেই চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য আনীত হন। কিন্তু শাস্ত্র চর্চ্চায় তাঁহার কিছুতেই মনোনিবেশ হইল না। এখানে আসিয়াও তিনি তাঁহার অতি প্রীতিকরী বাল্যক্রিড়া ছাড়িতে পারিলেন না।

তৎপর ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে মাড়বংসের গৌরব স্বরূপা রাণি রাসমনি দাসী কলিকাতার উত্তর দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বহুব্যয় করিয়া একখানি কালী প্রতিমা স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজকরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। সুতরাং রামকৃষ্ণকেও তাঁহার ভ্রাতার অনুগমন করিতে হয়। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দুই তিন বৎসর যাবৎ মাত্র মায়ের পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পান। এই সময়ে রামকৃষ্ণের কোন কার্য্যই ছিল না। অনন্ত লীলাময়ীর অদ্ভুত লীলা কে বুঝিতে সক্ষম। হঠাৎ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন। যাঁহার, তাঁহাকেই সাজিল। নির্ম্মল হৃদয় রামকৃষ্ণ মায়ের পূজার ভার লইয়া বড়ই অনুরাগের সহিত মায়ের পূজার্চ্চনাদি করিতে লাগিলেন। এইসময় অর্থাৎ অনুমান যখন তিনি ষোড়শবর্ষে উপনীত হন তখন হুগলী জেলার অন্তঃর্গত জয়রামবাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সারদা

সুন্দরী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর পুনরায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমণ করিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত হন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন। সংস্কৃত ত দূরাস্তাং, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায়ও ভালরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার উপর মায়ের পূজার ভার অর্পিত হইলে তিনি যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া যথাজ্ঞান পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ এক মাত্র অকপট ভক্তি। তিনি যে দিবস হইতে পূজার ব্রতি হন, সেই দিবস হইতেই পরম ভক্তি সহকারে মায়ের পূজার কার্য্য সমাপন করিতেন। পূজান্তে একদৃষ্টে অনিমেষ লোচনে মায়ের মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন এবং সজল নেত্রে নানাবিধ শক্তি বিষয়ক গান করিয়া নিজ জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্জক আক্ষেপ করিতেন। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর দেবীর আরতি সমাপ্ত করিয়া অনুরাগের সহিত ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের রচিত একখানি সঙ্গীত করিতে করিতে এতই বিহ্বল হইয়া পড়েন যে অশ্রুধারায় গণ্ড ও বক্ষস্থল ভাসাইয়া ভূমে নিপতিত হইতে লাগিল, মায়ের দয়ামাখা ভুবন মুগ্ধকর মুখের উপর দুইটী নয়ন বিন্যস্ত করিয়া নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ প্রায় যেন অন্তর্দৃষ্টি

ও বহির্দৃষ্টি এক হইয়া গিয়া বাহিরের বিষয়ে একবারে উপলব্ধি বিহীন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া উচ্চৈশ্বরে এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"মা রাম প্রসাদকে দেখা দিলি, তবে আমায় কেন দেখা দিবিনি মা?" এইরূপ বলিতে বলিতে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, সে ক্রন্দনধার শীঘ্র থামিল না। যেন রামকৃষ্ণের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত প্রবল সাধনার সংস্কার রাশি উদ্দিপক কারণের সহায় পাইয়া শতগুণ বেগে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বজন্মের সাধনলব্ধ যে ভক্তি নদীর প্রবাহ জন্মান্তর গ্রহণরূপ প্রবল অন্তরায়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অদ্য যেন তাহা কি কৌশলে অপসারিত হইয়া গেল; কালিসমুদ্রে মিলিবার নিমিত্ত ভক্তির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। রামকৃষ্ণের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ কখন কাঁদেন কখন হাসেন, কখন নৃত্য করেন, কখন বা মা মা মা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। সাধারণ চক্ষে তিনি প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় ফিরিতে লাগিলেন। কখন গঙ্গাতীরে উত্তপ্ত বালুকার উপর মুখ ঘর্ষন করিয়া উচ্চৈশ্বরে বারম্বার কেবল বলিতেন মা আমায় ভক্তি দে", কখন গভীর নিশিতে শ্মশান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ খানি সাষ্টাঙ্গে ভুমিসাৎ করিয়া

কাঁদিবেন আর বলিতেন মা শ্মশানবাসিনী তুই নাকি ভয়ঙ্করী-রূপে, শ্মশানে আসিয়া সাধকদিগকে ভয় দেখাস, আজ আমাকেও একবার সেইরূপে এসে দেখা দে মা। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সকলেই তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্থ স্থির করিয়া নানারূপ চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ডাক্তার রাম নারায়ন রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য চিকিৎসক নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারেন নাই। ডাক্তারের ঔষধ দেখিয়া তিনি নাকি একদিন বলিয়াছিলেন, যে আমি যার জন্য পাগল তোমার এ ঔষধ খাইলে কি তাহাকে পাইব?" অহো! যিনি ভবরোগ হইতে মুক্ত হইতে চান, তাঁহাকে সামান্য ডাক্তারে কি করিবে, সুতরাং তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ভক্তির ভগবান, বিশ্বাসীর ঠাকুর। আর কি তিনি থাকিতে পারেন। রামকৃষ্ণের অকপট ও অহেতুকী ভক্তি দেখিয়া যেন তিনি তাঁহার ঈশ্বর দর্শন বাসনা চরিতার্থ করিলেন। রামকৃষ্ণের উন্মত্ততার কিঞ্চিৎ উপসম হইল। ক্রমে চিত্ত স্থির হইয়া আসিল। তখন তিনি প্রবল অনুরাগের সহিত সাধন ভজনের দিকে চিত্ত নিয়োজিত করিলেন।

সাধনাবস্থা।

কলিকাতার উত্তর ন্যূনাধিক ক্রোশত্রয় ব্যবধানে ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীরে দক্ষিনেশ্বর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিন সীমায় একটি অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ কালি মন্দির যেন ভাগিরথীর গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে দ্বাদশটি শিব মন্দির শারি শারি শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। স্থান জনশূন্য ও অতি নিস্তব্ধ। যে দ্বাদশটী মন্দিরের কথা বলিলাম তাহারা গঙ্গার সহিত সংলগ্নভাবে সংস্থাপিত। এই মন্দির গুলির উত্তরে একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। সেই গৃহেই পরমহংসদেব সর্ব্বদাই থাকিতেন ও নিজ কার্য্য করিতেন। এই গৃহের সন্নিহিত উত্তরে কএকটী সুবৃহৎ ও অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষতলই পরমহংসের সাধনার স্থান। এই স্থানে তিনি নানাবিধ সাধনা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি গোকল হইতে বেদ পুরাণ, তন্ত্র, কোরাণ এবং অন্যান্য প্রত্যেক শাখা ধর্ম্ম প্রণালীর কোন প্রক্রিয়া করিতে বাকি রাখেন নাই। সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তিনি যখন যে প্রণালীর সাধনা করিতে সংকল্প করিতেন, তখনই সেইরূপ সাধন প্রণালীর একজন আকরিয়া সিদ্ধ গুরু

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত দীক্ষা দিয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণও গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া ঐকান্তিক সাধন বলে দিবসত্রয় মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিতেন। ধর্ম্মপথের পথিক মাত্রেই বিখ্যাত সাধক তোতাপুরীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। শুনিয়াছি ঐ দিবসত্রয়মাত্র সাধনায় তিনি সর্ব্বসজ্জনবাঞ্ছনীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কথিত আছে, যে, এই সময় তোতাপুরী তাঁহাকে পরমহংস উপাধি দিয়া যান।

এই সময়ে রামকৃষ্ণের কার্য্য কলাপ কেহ দেখিতেও পাইত না বুঝিতেও পারিত না। পূর্ব্ব হইতেই লোকে তাঁহাকে উন্মাদ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার নূতন নূতন ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে আরও পাগল, বুজরুক প্রভৃতি নানা অভিধানে অভিহিত করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে এক নবীনা তান্ত্রিক সাধিকা যোগিনী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া অতি সাবধানের সহিত রামকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং নানাবিধ কঠোর সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া যান। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রামকৃষ্ণের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করেন এবং রামকৃষ্ণের বাক্য ও মানসিক

লক্ষণ দেখিয়া বৈষ্ণবগণের সিদ্ধাবস্থায় মহাভাবের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া দেন, যে, ভক্তি সাধনে ভক্তের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। যোগিনী, রামকৃষ্ণকে লোকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার উপর অন্যায়াচরণ না করে, তজ্জন্য নানা ভাবে তাহাদের তাঁহার মহাভাবের বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু সাধারণের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল না,—তামসিক প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক উক্তি স্থান পাইবে কেন? সকলেই তাঁহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিত।

সাধনকালে তিনি অহংত্যাগ করিবার জন্য দাস্য সম্মার্জ্জনী ধারণ পূর্ব্বক মল মূত্রের স্থান পরিষ্কার করিতে করিতে রোদন করিয়া বলিতেন "মা আমার অহঙ্কার নাশ করে দে, আমার শুচি অশুচিবোধকে বিনষ্ট করে দে মা। আমি হীনের হীন, দীনের দীন, রেণুর রেণু, সকলের দাসানুদাস, এই ভাব যেন প্রাপ্ত হই। বৈরাগ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি একাকী জাহ্নবী তটে উপবেশন করিতেন এবং এক হস্তে মুদ্রা ও অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন "মন একে বলে টাকা, ইহা জড় পদার্থ। রূপার চাক্তি এবং বিবির মুখ আছে। ইহার দ্বারা চাল হয়, ডাল হয়, ঘর বাড়ী হয়, হাতি ঘোড়া হয়। জড়ে জড়ই লাভ হয়, কিন্তু সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে

টাকাও যা মাটিও তা। মাটিতে ধান হয়, অন্যান্য ফল মূলাদি হয়, তাহাও ত জড়, তাহাতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যদি টাকা ও মাটি একই হইল, তবে টাকার প্রতি মনের আশক্তি থাকিবে কেন? টাকা মাটি, মাটি টাকা একই বস্তু। এই বলিয়া উহাদের জলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেন। কামিনী আর কাঞ্চন সাধন তাঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেতেই শক্তিরূপিনী মহামায়ার আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন এবং স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রেই তাঁহার বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হইত। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিবাহান্তর তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে একবার মাত্রও অবসর হয় নাই, কারণ, বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। তিনি বলিতেন, "যে, স্ত্রীযোনি হইতে মনুষ্য প্রসব হইয়া দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করে, সুতরাং উহা মাতৃস্থানীয়া। সাধকের পক্ষে উহার অনুরূপ ব্যবহার অবিধেয়"।

যাহা তাঁহার সাধনার অন্তরায় বোধ হইত, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিতেন। এক দিবস তাহার কোন ভক্ত একখানি মূল্যবান পট্ট বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত পরাইয়া দেন। তিনিও আনন্দের সহিত পরিধান করিয়া

তাহার সাধনার স্থান বৃক্ষতলে যাইয়া বৃক্ষটী প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন ভগবানের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন, অমনি তাঁহার বস্ত্রের দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মিল,—যে, পাছে উহাতে ধুলা লাগে। ভক্তের প্রণামে বাধা পড়িল, আর কি ভক্ত স্থির থাকিতে পারেন, তৎক্ষনাৎ পরিধেয় পট্ট বস্ত্র সজোরে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর শান্ত চিত্ত হইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

এই সময় রাণি রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয় রামকৃষ্ণের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্য কলাপ পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে মথুর বাবু তাঁহার সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমস্তই যে রামকৃষ্ণের ভণ্ডামী ইহাই স্থির করিলেন। এবং সেই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় হইয়া তিনি নানারূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া নবযৌবন সম্পন্না সুরূপা সুবেশা ব্যাশ্যাব্যবসায় বিশেষরূপে পারদর্শিনী, বারাঙ্গনাদিগকে নিজ বাগান বাটীতে লইয়া আসিয়া তাঁহার সুসজ্জিত ও মনোরম বৈটকখানায় মনোমতভাবে সাজাইয়া বসাইতেন। তৎসঙ্গে উহাদের নিত্য সহচর সুরারও অভাব থাকিত না। যাহাতে রামকৃষ্ণের চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তজ্জন্য সকল প্রকার উপায়

অবলম্বন করিতে তাহাদের আদেশ করিতেন। এইরূপে সমস্ত স্থির করিয়া রামকৃষ্ণকে ডাকিতে পাঠাইতেন। এই সময় রামকৃষ্ণের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যে, স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র তাঁহার সম্পূর্ণ সমাধি হইয়া যাইত। মথুর বাবুকে তিনি প্রথম হইতেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুতরাং তাঁহার আহ্বানে কোন দ্বিধা না করিয়া ধীরে ধীরে বৈটকখানা মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া তাঁহার সমাধি হইয়া যায়। এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় ভূমিতে বসিয়া পড়েন। মথুর বাবুর আদেশ ক্রমে সেই অবস্থাই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসান হইত। তৎপর উপস্থিত বারাঙ্গনাগণ নানারূপ ভাব ভঙ্গি ও বিবিধ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিত না। এইরূপে মথুর বাবু তাঁহাকে আরও কলিকাতার নানাস্থানের বারাঙ্গনালয়ে লইয়া ফিরিয়াছিলেন কিন্তু কোথায় তাঁহার মন চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব বলিতেন কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষী যাহারা স্ত্রী-শ্রেণীভুক্ত তাহারাই প্রকৃতির অংশ বিশেষ, অতএব মাতা। সুতরাং যিনি এই ভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতেন তাঁহার কি আবার স্ত্রীলোক দর্শনে মন চাঞ্চল্য হইবার সম্ভব?

মথুর বাবু এইরূপ নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা যখন

রামকৃষ্ণকে কিছুতেই ভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার মনের ভাব অন্যরূপ ধারণ করিল। তিনি তখন আর রামকৃষ্ণকে সামান্য মনুষ্য ভাবে দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়া পড়িল যে, তিনি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি রামকৃষ্ণকে স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া নিজ স্ত্রী ও কন্যাদিগের দ্বারা তাঁহার সেবা সুশ্রূষাদি কার্য্য করাইতেন। স্ত্রীলোকেরাও অতি আনন্দে পরম ভক্তি সহকারে সাধু সেবা করিয়া আপনাদের কৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণকে যেন আপনাদের কোলের শিশু মনে করিতেন এবং সেই ভাবেই সেবা সুশ্রূষা ও আহারাদি করাইতেন। রামকৃষ্ণও মায়ের ছেলের মত হাসিয়া খেলিয়া তাঁহাদের সহিত দিন কাটাইতেন।

তৎপরে মথুর বাবু তাঁহাকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। ক্রমে কাশী বৃন্দাবন গয়া প্রভৃতি মহাতীর্থ সকল ভ্রমণ করেন। তীর্থাদি দর্শন কালীন তিনি তথাকার দেবালয়াদি দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, মা আমার সেখানেও যেমন এখানেও সেইরূপই, তবে সেখানে আর এখানেত কিছুই প্রভেদ দেখিতেছি না। মায়ের সেখানকার তেঁতুল গাছটীরও যেমন পাতা, ডাল, এখানকার তেঁতুল গাছটীরও সেই

রূপই পাতা ডাল"। রামকৃষ্ণের নির্ম্মল চক্ষু দিব্যভাব ধারণ করিয়াছে! সে চক্ষে কি আর প্রভেদ দৃষ্টি হইতে পারে? তিনি তখন জগৎময় এক জগন্ময়ীরই সত্তা অবলোকন করিতেছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাধিকা, কাশীতে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা, গয়ায় গদাধর সকলই কেবল এক মায়েরই রূপান্তর মাত্র বলিয়া তাঁহার চক্ষে দিব্য আভাসিত হইতে লাগিল,—ভক্তের দৃষ্টিই এইরূপ। গয়ায় আসিয়া গদাধরজীউর শ্রীপাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্তের এক অপূর্ব্ব অবস্থা হয়। তখন তিনি সেই অবস্থায় নাচিতে নাচিতে কি যেন কি এক ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তাঁহার সে অবস্থা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি ভিন্ন সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশের ব্যাখ্যা করিতে অন্য কেহই সক্ষম নহে। এইরূপে তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া তিনি পুনরায় দক্ষিনেশ্বরে আপন সাধন পীঠে আসিয়া বসিলেন। এই সময় হইতে তিনি দক্ষিনেশ্বরের দেবালয়েই সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। মধ্যে মধ্যে কোন ভক্ত কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাইতেন মাত্র। কলিকাতা সিন্দুরীয়াপটী নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় পরমহংসকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে সিন্দুরিয়াপটীর নিজ আবাসে লইয়া গিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করি-

তেন। যখন তিনি শম্ভু বাবুর বাড়ীতে আসিতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুলোকের জনতা হইত। নানালোক নানা ভাবে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। পরমহংসের নিকট কেহ উপস্থিত হইলেই, তিনি যে শ্রেণীর যে জাতীর লোক হউন না কেন, তিনি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। একদিন বৈষ্ণবচরণ নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পণ্ডিতকে দেখিবামাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহন করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পণ্ডিত বৈষ্ণব চরণ তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া ভক্তি ভরে নানা ভাবে পরমহংসের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমেই রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ভাবের কথা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রামকৃষ্ণকে জানিতেন না এরূপ সাধু সন্ন্যাসী ভারতে অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন ব্রহ্মচারীর নিকট রামকৃষ্ণের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল। আমরা তৎপূর্ব্ব হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম কিন্তু তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি

পাইল। তৎপর আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ সকল শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিতাম। আমরা এই সময় তাঁহার নিকট নানা ধর্ম্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন, হিন্দুত আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানীব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তি গদগদভরে তাহার চরণ প্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশব বাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্ত্তনেরই ফলে "নব বিধান" প্রসব হয়। কেশব বাবুর শিষ্যেরা যাহাই বলুন আমাদের বিশ্বাস যে, যদি কেশব চন্দ্র জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্ভীক হৃদয় এসত্য প্রকাশে কদাচ কুণ্ঠিত হইত না। আমাদের সহিত কেশব বাবুর বিশেষ রূপই পরিচয় ছিল; এবং অনেক সময় তাহার সহিত পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াও দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেশব বাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতেন। এই সম্বন্ধে

আর একজন পরমহংসদেবের ভক্ত কি বলিতেছেন, দেখুন।

"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভক্তি সাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মোপদেশের পরাক্রমে কেশব বাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না।

কেশব বাবু যে সময়ে পরমহংসদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্ম শক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই তর্কের দ্বারা কেশব বাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মাধুর্য্য রস তাঁহার মধ্যে রক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশব বাবু নব বিধান বলিয়া যে নূতন ধর্ম্মভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন ফলের আভাস মাত্র বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব নিজে

সাধন দ্বারা সকল ধর্ম্মের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়াছিলেন। কেশব বাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিগরি করিয়া অর্থাৎ যে ধর্ম্মে যেটুকু সার বলিয়া তিনি বুঝাইলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের সৃষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ, নামক মহাত্মা হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলিতেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক মতই সত্য। যে মতে প্রেমের কাহিনী কথিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রেম বিচ্যুত করিয়া লইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যেমন কোন ব্যক্তির শরীর, কাহার হস্ত এবং কাহার পদ কর্ত্তন করিয়া একটী কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি সংগঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা সেই সেই শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রসূত হইয়াছে। তাহার শোভা স্বাভাবিক কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে, তাহাতে একটী একটী স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, তাহারই

থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, তাহা তাহারই প্রথম হইতে গণনা না করিলে সে ভাব কস্মিনকালে প্রস্ফুটিত হইবে না। যেমন সন্তানের বাৎসল্য প্রেম সন্তান ব্যতীত স্ত্রী কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পিতায় কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিলে কখনই বিকশিত হইতে পারে না, তেমনই ধর্ম্মের ভাব জানিতে হইবে। ঈশার প্রেম ঈশার প্রণালীতে, চৈতন্যের ভক্তি চৈতন্য সম্প্রদায়ে, বুদ্ধের জ্ঞান বৌদ্ধমতে পরিচালিত না হইলে সেই সেই বিশেষ ভাব কদাপি লাভ করিবার কি সম্ভাবনা আছে? পরমহংসদেব সেইজন্য যখন যে যে মতে সাধন করিয়াছিলেন তখন সেই সেই মতের কোন প্রক্রিয়া স্বেচ্ছাচারীর বশবর্ত্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা পরমহংসদেবকে নব বিধানের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বলিয়া সংবাদ পত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এইজন্য বলি যে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। পরমহংসদেব সেরূপ সর্ব্বধর্ম্ম বিশ্লিষ্ট করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এককালে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে যে কেহ কোন মত বিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্ম্মপথ বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা তাঁহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে।

ইহা ভূরি ভূরি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তিনি সাব্যস্থ করিয়া দিয়াছেন।

প্রচার কার্য্য।

আমাদের স্মরণ হয় যেন ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরমহংসদেব তাঁহার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে কেশব বাবুর সহিত তাঁহাব পরিচয হয়। তাহার প্রকৃতিব এই একটি আশ্চর্য্য ভাব ছিল, যে, তিনি কোন ব্যক্তির সাধুতার পবিচয পাইলে, বিনা আহ্বানে উপযাচক হইযা তাঁহার সহিত পরিচয কবিয়া আসিতেন। লোক মুখে কেশব বাবুর নানারূপ গুণ গ্রামের কথা শুনিয়া তিনি একদিন অকস্মাৎ তাঁহাব নিকট উপস্থিত হন। এই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি কেশব বাবুর হৃদয় আকর্ষণ কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেশব বাবুর মত একজন "নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক"ও তাঁহাব সরল অথচ গভীরভাবপূর্ণ উপদেশে মুগ্ধ হইয়া যান। এবং পরে কেশব বাবুই তাঁহার প্রচার কার্য্যের প্রধান সহায়ক হন এবং তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত করিয়াদেন। তিনি নানা-স্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহুত হইয়া গমন

করিতে লাগিলেন এবং আপামর সাধারণ লোকদিগকে ভক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া মোহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমভাবেই মিশিতেন। ব্রাহ্ম তাঁহাকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবিয়া সাদরে মস্তক অবনত করিত, বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি জ্ঞানে, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিত, শাক্ত তাঁহাকে একমাত্র শক্তিরই উপাসক বোধ করিয়া বিশেষ সম্মান করিত, বৈদান্তিক তাঁহাকে একমাত্র প্রণব মন্ত্রের সাধক জ্ঞান করিয়া তাঁহার অশেষ গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। এইরূপ তাঁহাকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক নিজ দলভুক্ত ভাবিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধভক্তের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা তাঁহাতেই দেখা যাইত। তিনি কখন কোন সম্প্রদায় অথবা মতকে ঘৃণা বোধ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, যেমন একোয়া, ওয়াটার, পানি, জল, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বলিলেও যেমন এক জলকেই বুঝায়, তেমনি, গড্, ঈশ্বর, আল্লা প্রভৃতি নামে ডাকিলেও সেই একই ঈশ্বরকেই ডাকা হয়। কিন্তু যেমন, জল পান না করিয়া কেবল মুখে ওয়াটার প্রভৃতি নানা নামে ডাকিলেও তৃষ্ণা দূর হয় না, সেইরূপ অন্তর বাহিরে ঈশ্বর দর্শন পূর্ব্বক অনুরাগের সহিত না ডাকিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে কোন ফলই দর্শেনা। পরমহংসদেবের উপদেশের

অতি সুন্দর মাধুর্য্য ছিল। তিনি অতি গভীর বিষয় সকল, যাহা নানা দর্শন বিজ্ঞান দ্বারা বুঝান সুকঠিন হইয়া উঠে, তাহা সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। শত শত লোকের মধ্যে বসিয়া তিনি দুই একটি এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন যাহাতে সমবেত সমস্ত লোকেরই জিজ্ঞাস্য সন্দেহ সকল মিটিয়া যাইত। অতি কঠোর নাস্তিকেরাও তাঁহার সহবাসে আত্মজ্ঞানলাভ করিত। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। অতি পাষণ্ড কদাচারী কদাহারী নাস্তিকদল আসিয়া ক্রমেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দেখিলে বড়ই যত্ন করিতেন এবং আশ্বাস বাক্যে পরিতোষ্ট করিতেন। তন্মধ্যে এমন কএকজনকে আমরা জানি, যে, তাঁহাদের সংসারে অকার্য্য কিছুই ছিল না, পশুরও যাহা অকর্ত্তব্য মনে হয় তাহাও তাঁহাদের দ্বারা অবলীলা ক্রমে সাধিত হইত; এরূপ ভয়ঙ্কর পাষণ্ডদলও তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে। এখন তাঁহাদের চিনিয়া উঠা ভার। তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার ইহ জীবনের মত সংসার সুখে জলাঞ্জলী দিয়া একবারে কঠোর সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বোধ হয় বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন এবং তাঁহার

পূর্ব্ব চরিত্রের বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন। তিনি সংসারে পাপ বলিয়া একটা কিছু আছে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। এখন সেই গিরিশ বাবুকে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেবল মাত্র পরমহংসদেবের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই মুখে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলেন, যে, পরমহংসের সহিত আমার এক একদিনের মিলন আমার হৃদয়ে এক একটি করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। গিরিশ বাবুকে সাধারণে জানেন বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এরূপ যে কত পাপী উদ্ধার পাইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সেই জন্যই আমরা বলি কেবল মানুষের ক্ষমতায় কি এত সম্ভবে?

১২৯১ সালের আষাঢ় মাস মানব ইতিহাসের একটি যুগান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতাব্দির পর শতাব্দি হইতে ভারতবর্ষ বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ ও যবনের ঘোর অত্যাচারে ধর্ম্মহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মগতপ্রাণ ভারতবাসী স্বেচ্ছাচারের দাস হইয়া নাস্তিকতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। এমনিই দিন দিন কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল, যে, তাহা দেখিয়া আবার ভারতে পুনরায় সুপ্রভাত হইবে তাহা কে,

স্বপ্নেও আশা করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে যেন ভারতের উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পড়িল,—বিধি এক সময়ে নানাপ্রকার প্রাসঃঙ্গিকশুভঘটনা লইয়া ভারতের অনুকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্ব হইতেই কএকজন বিদেশী বিধর্ম্মী আর্য্যধর্ম্মের গুণগানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশে দেশে আর্য্যধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া ভারত-বাসীদের প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। এদিকে ভক্ত-প্রবর পরমহংসদেব সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে থাকিয়াও ভস্মা-চ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া স্থান বিশেষে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতেছিলেন। নব্য সম্প্রদায়ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় আচার্য বর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি যেন স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময়, যে ভাবে ও যে অবস্থায় আচার্য্যদেব ধর্ম্মপ্রচার জন্যবহির্গত হন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার আগমন দৈবঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। যখন তিনি তাঁহার কঠোর সাধনালব্ধ প্রতিভা বলে শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল। ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

চারিদিকে হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল

ঘোর নাস্তিকেরও চিত্তের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আবার যেন ভারতে সত্বরই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে এইরূপ আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সমস্ত হিন্দু এক হইয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সমূহ তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে বসিয়াই এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। আচার্য্যদেবের আগমনাবধি তিনি সাবধানের সহিত তাঁহার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন।

একদিবস আচার্য্যদেব তাঁহার কলিকাতার আবাস ভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসুশ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস অচৈতন্য,— একবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া

অনিমেষ লোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জ্জিত প্রফুল্ল মুখ কমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাঁহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনে অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন "মা! শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে কেন, মা! আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা। আমায় ভাল কবে দে, মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই শশধব। দেখ্, আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি. এমন সময় মা আমায় বলিলেন, যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ! আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করিলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাহার কাছে যা, গিয়ে দেখা ক'রে আয়গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিলাম না। অমনি চ'লে এলাম। অনেকদিন আসিব আসিব করিতেছিলাম,

আজ তা হইয়া গেল'। এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর দুইজনে নানা ভাব ভঙ্গিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্যদেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।

পরমহংসদেব সাধনার দ্বারা অহংভাব নষ্ট করিয়া কত উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এ ঘটনাটি এ স্থানে উল্লেখ করিলাম। তিনি কোন ভক্ত কি প্রেমিকের সন্ধান পাইলেই মহানন্দে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতেন। তাহাতে তাঁহার কোনরূপ মন বিকার উপস্থিত হইত না। তিনি যতদিন সুস্থাবস্থায় ছিলেন, ততদিন মধ্যে মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া উভয়ে প্রেমানন্দে মাতিয়া পরম সুখ অনুভব করিতেন। আচার্য্যদেবও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন বর্ত্তমান সময়ে এরূপ উচ্চ অঙ্গের ভক্তির সাধক অতি বিরল। সময়ে সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন " লোকটাকে সাধারণে চিনিতে পারিল না,

পারিবারও কথা নহে। চিনিতে না পারিয়া লোকে অন্যরূপ ব্যবহারে তাঁহার অনেক ক্ষতি করিতেছে। একদিন পরমহংসের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, " পরমহংসের অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া বড়ই হৃদয়ে আনন্দ হয়, যে, ভারতে এখনও এরূপ লোক জন্ম গ্রহণ করিতেছেন।

কৈবল্য প্রাপ্তি।

এইরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রচার কার্য্য করিতে করিতে তিনি ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচারের প্রধান অঙ্গ ভক্তিমাখা সঙ্গিত; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বদা কণ্ঠের ব্যবহার করিতে হইত। অকস্মাৎ একদিবস তিনি গলদেশে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ কষ্ট প্রকাশ করিলেন না এবং তাহার জন্য কোনরূপ যত্নও লইলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন ও গান করিতেন। সুতরাং ক্রমেই বেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ বেদনার উপশম লাভের জন্য কিঞ্চিৎ সাবধান হইতে

অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "আমিত সাবধান হ'তে চাই, কিন্তু যখন মা বাহ্যজ্ঞান নষ্ট ক'রে দেন তখন আর কিছুতেই নিজ কর্তৃত্ব আনিতে পারি না। তবে আমি কি করিব ?" অবশেষে বেদনার স্থানে একটি স্ফোটক জন্মিল। স্ফোটকটী কখন শান্ত অবস্থায় থাকিত কখন বা বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিত। ক্রমেই স্ফোটকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল তৎসঙ্গে আহারও বন্ধ হইয়া গেল। তরল পদার্থ ভিন্ন কিছু গলধঃকরণ হইত না। যাহা কিছু আহার করিতেন তাহা অতি কষ্টের সহিতই ভোজন করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত ভয়ঙ্কর পীড়াতেও তিনি একদিনের জন্যও কোন যন্ত্রণা বোধ করেন নাই এবং ক্ষণকালের জন্যও ম্রিয়মাণ হন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ হাসিতেন, আনন্দ করিতেন, এঅবস্থাতেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। সাধকগণের কেমন আশ্চর্য্যরূপ তিতিক্ষা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহা সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; ভক্ত আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া কিরূপ অলৌকিক ভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন তাহা সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং মায়ের যে ছেলে হয় তাহাকে কেহ কিছুতেই বিরক্ত বা মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় না তাহা সকলে দেখিয়া দিব্য জ্ঞানলাভ করিলেন।

এমৎ রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া শিষ্যেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া অতি যত্ন সহকারে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। বহু যত্নেও তাঁহার বেদনা উপশমের কোন উপায় করিতে পারিলেন না। পুনরায় ডাক্তারদিগের পরামর্শে তাঁহাকে কাশীপুরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বড় বড় ডাক্তার যাইয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি এই সময় হাসিয়া বলিতেন, দেখ, আমার দেহটা যেন একটা কাগজের গৃহ, আর এই স্থানটায় যেন একটা ছিদ্র হইয়াছে। ক্রমে যখন অতি ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া অস্থি পঞ্জরের পিঞ্জর স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিজ দেহ দেখাইয়া বলিতেন; দেখেছ? দেহটা কেবল যেন একটা হাড়ের খাঁচা মাত্র, এতে কিছুই নাই, হয়ও না কিছু এক মাত্র সচ্চিদানন্দই সত্য। মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত শিষ্যদিগকে এইরূপ নানা প্রকার গভীর উপদেশ দিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস (৩১শে শ্রাবণ) তাঁহার একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, পাঞ্জিখান দেখত। শিষ্য পাঞ্জি লইয়া ৩১শে শ্রাবণের সমুদায় বিবরণ পাঠ করিয়া যেমনই ১লা ভাদ্র পাঠ করিলেন, অমনিই পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন, "হইয়াছে, আর না"।

তৎপর দিবস চিকিৎসক আসিবামাত্র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এতদিন ধরিয়া কি করিতেছ? রোগ কি আরোগ্য হবে না? চিকিৎসক নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন তিনি একটু মৃদু হাসিয়া এক-জন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া হস্তে তুড়ি দিয়া বলিলেন, ওহে। এরা এতদিন পরে বলে কি? ক্রমে ১লা ভাদ্রের কাল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তগণেরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা সযত্নে সে দিবস পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। তিনিও প্রাপ্ত পায়সান্ন টুকু সে দিবস সমস্তই ভক্ষণ করি-লেন, একবিন্দুও পরিত্যাগ করিলেন না। পরে শয়ন করিযা নিদ্রা যান। রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রোত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নিজ উদর দেখাইযা বলিলেন, দেখেছ? ইহাকে শ্বাস বলে। এই বলিয়াই সমাহিত হইলেন। সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। ১৮০৮ শক ১ ভাদ্র তারিখে ভক্তকুলচূড়ামণি মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস জড়দেহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এ মায়াময় সংসার ছাড়িয়া কৈবল্য ধামে গমন করিলেন। নিয়তির বশেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। নিয়তি খণ্ডনে কাহারও সাধ্য নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ শুকদেব, ভৃগু, ভার্গব, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ,

কপিল বেদব্যাস, কশ্যপ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাসাধকগণও যে নিয়তি খণ্ডাইতে সমর্থ হন নাই, আজ আমাদের ভক্তাদর্শ পরমহংসদেবও সেই নিয়তির বশে এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। মানুষ যেখানে যাইবার জন্য লালায়িত সেস্থান যদি সে দিব্য চক্ষে অবলোকন করে তাহা হইলে কি আর সে আর এ যন্ত্রণাময়, পাপপূর্ণ, বিপদের আকর সংসারে থাকিতে চায়? কখনই না। সাধক যে জন্য এখানে আসিয়া থাকেন তাহার সেই কার্য্যটি সিদ্ধ হইলেই তিনি আর এক মুহূর্ত্তও আমাদের ন্যায় নরকীটদিগের সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছুক হয়েন না। পরমহংসের উদ্দেশ্য সাধিত হইল, তিনি আর কেন সংসারে থাকিবেন, তজ্জন্যই তিনি সমস্ত মায়া মমতার বিসর্জ্জন দিয়া আশ্রিত শিষ্যদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া চলিয়া গেলেন,—পশ্চাৎ যাহা থাকিল তাহা কখনও নষ্ট হয়ও নাই, হইবেও না।

পরিশিষ্ট।

ভগবদ্ভক্তগণ যখন জগতে ধর্ম্মপ্রচার মানসে জন্মগ্রহণ করেন, তখন স্বয়ং ভগবান্ যেন ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য অসংখ্য প্রবল শত্রু দ্বারা তাঁহাদের পরিবেষ্টিত করিয়া নিত্য নব নব লীলা প্রদর্শন করেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যগণই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইতিহাস দেখিয়া মনে হয় যে, যখন "বড় লোক" হইলেই তাহার শত্রু অনিবার্য্য তখন শত্রু সংখ্যা অধিক থাকা একরূপ বড়-লোকের চিহ্ন বিশেষ। শত্রুরাই গুণীর প্রকৃত গুণ প্রচার করে, পরীক্ষার প্রচণ্ড অনলে পরিপক্ক করিয়া দেয়, মহাত্মার অন্তর্নিহিত ভাবরাশিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হিরণ্যকশিপু যদি সন্তানের উপর খড়্গহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে শিশু প্রহ্লাদেরও হরির শ্রীপাদপদ্ম কামনায় এত অধিক উৎসাহ হইত না ভগবানেরও ভক্তকে "রক্ষা" করিবার জন্য আবির্ভাবেরও প্রয়োজন হইত না, ধ্রুব যদি বিমাতা কর্ত্তৃক অতি ঘৃণিত ভাবে ধিকৃত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের সে উত্তেজনাও হইতনা তাঁহার পদ্মপলাশলোচনের দর্শনাকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হইতনা

সেইরূপই যদি শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যপ্রভু সর্ব্বদা প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিপীড়িত না হইতেন তাহা হইলে কদাচ তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনে এত উদ্যম ও উৎসাহ দেখা যাইত না। পরমহংসদেবেরও সেইরূপ শত্রুর অভাব ছিল না। যতই তাঁহার মহিমা প্রচার হইতে লাগিল ততই তাঁহার শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য বহুজনে তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অনুযোগ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, তিনি যে অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক তাহাই প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি প্রথম অভিযোগ,—তিনি অত্যন্ত যশোলিপ্সু ছিলেন। দ্বিতীয়,—সেই যশোলিপ্সার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন ও তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের অনুকূলে মত দিতেন। তৃতীয়,—তিনি অত্যন্ত কদর্য্য প্রকৃতির লোকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়ায় তাহারা তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহার আত্মার বিশেষ অবনতি সংসাধিত করিয়াছে। চতুর্থ,—তিনি একদিকে পরমহংস ছিলেন অথচ তাঁহার সকের পরিসীমা ছিল না।

এখন আমরা এগুলি প্রকৃত অভিযোগের যোগ্য কি না তাহাই আলোচনা করিব। মানুষের "চেষ্টা" দেখিয়া

তাহার অভিপ্রায় স্থির করিতে হয়। সুতরাং পরমহংসদেবের যে যশ প্রাপ্তি অভিপ্রায় ছিল কি না তাহা তাঁহার চেষ্টা দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাহার জীবনে কোনরূপ চেষ্টার কার্য্য দেখিতে পাই না। তাঁহার নিজের (অর্থাৎ আত্মোন্নতি) কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন্ কার্য্যই ছিল না। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে অনুরাগী ভক্তদের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কখন কখন তাঁহাদের আবাসে গমন করিয়া সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা অমূল্য উপদেশ রাশি বিতরণ করিতেন। ইঁহাই যদি তাঁহার যশোলিপ্সার কারণ হয়, সে কারণ সহস্রবার প্রার্থনীয়। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে সম্প্রদায় বিশেষের সহিত তিনি কি স্বয়ং উপযাচক হইয়া ঘনিষ্ঠতা করিতেন না তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঘনিষ্ঠতা প্রর্থনা করিলে তিনি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেন? ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। তিনি সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। যদি উদ্দেশ্য সকলের একই হয় তবে তাহার ভিন্নতায় কোনটী অধিকায়াসসাধ্য কোনটি অল্পায়াসলব্ধ এই মাত্র বলিতে পারা যায়। চরমে কিন্তু জীব মাত্রেরই একই গতি ইহা নিশ্চয়। ইহাই হিন্দুর মত ও বিশ্বাস।

হিন্দু বলেন যেখানে অকপট ভগবদ্ভক্তি আছে সেই খানেই সত্যের জ্যোতি কিছু না কিছু বিভাসিত হইয়া থাকে। সত্য যাহা তাহা সকল সম্প্রদায়েই এক। সুতরাং পরমহংসদেব যখন সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেন তখন যেখানে সত্য আছে তাহার সহিত ঐকত্ব সম্পাদিত হইবেই হইবে। এই কারণেই পরমহংসদেবের কথা সকল সম্প্রদায়ের অনুকূল বলিয়া মনে হইত। তৃতীয় অভিযোগ শুনিয়া আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়; মনে হয়, যে ইঁহারা ভক্তের প্রকৃত লক্ষণ কি তাহাও অবগত নহে। ভক্তজীবনের লক্ষ্যই পতিতের উদ্ধার সাধন। তাই ভক্ত যতই ভক্তি সমুদ্রে ডুবিতে থাকেন ততই আনন্দে নাচিয়া বলেন "পান কর আর দান কর"। ভক্ত নিজের জন্যও যেমন কাতর জীবের জন্যও তেমনি কাতর। স্ত্রীজাতি সরলা, অবলা,—স্ত্রীজাতি দেবী, কেন না তাহারা একাকি আনন্দউপভোগে নিতান্তই অক্ষমা। সরল ভক্তও তদ্রূপ একক ভগবৎপ্রেমানন্দ ভোগ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না, কারণ তিনি দেবদেব। ভক্তপ্রবর পরমহংসের সরল প্রাণ দীন, হীন, পতিত দেখিলে কাঁদিয়া উঠিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোড় প্রসারণ করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইতেন। আমরা বিশ্বাস করি যে পতিতের সংস্পর্শে

ভক্তের উপার্জ্জিত সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া যায় সত্য,— কিন্তু ভক্তের যে মূল মন্ত্র "পান কর আর দান কর"। বিতরণ করিয়া না খাইলে সে অমৃত পরিপাক হয় না। সুতরাং সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভক্তগন সর্ব্বদা বিতরণ তৎপর। পরমহংসদেবও সেই জন্য অবাধে আশ্রিতদিগকে স্থান দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ভক্তোচিত কার্য্যই হইযাছে। চতুর্থ অভি-যোগটী শুনিয়া আমরা অবাক হইযাছি। পরম-হংস,—বৈরাগ্যের অবতার পরমহংস কিনা সৌখিন? হাসিও পায় দুঃখও হয়। তাঁহাকে নানারূপ বসন ভূষণ পরিতে দেখিয়া লোকে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছে। তাঁহাকে অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য দেখিলে এইরূপই অনুমিত হইবার অধিক সম্ভব। কেননা, আদর করিয়া যে ভক্ত যেরূপ ভাবে তাঁহাকে বেশ ভূষায় ভূষিত করিতে ভাল বাসিতেন তিনি সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে সাজাইতেন, তাহাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য তাঁহার সাধনার প্রতিকূলে না দাঁড়াইত ততক্ষণ তাহার এক খানিও পরিত্যাগ করিতেন না, বালকের ন্যায় সজ্জিত হইযা বসিয়া থাকিতেন। তদবস্থায় তাঁহাকে যিনি দেখিতেন তাঁহারই ঐরূপ ভ্রান্তি হইত। এইরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই তাঁহার নানারূপ কুৎসা রটাইত। কিন্তু মূঢেরা জানেনা, যে ইতিহাস জ্বলন্ত ভাবে

দিনদিন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে "সকল স্থানেই ভগবদ্ভক্তের জয় অনিবার্য্য। কাহার সাধ্য ভক্তের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় সুতরাং এখানেও ভক্তেরই জয় হইল। শত্রুদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। পরমহংসদেবের স্থূলদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহার অজর অমর নিত্য বুদ্ধ মুক্তাত্মা তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ে জ্বলন্ত ভাবে দেদীপ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। সাংসারিক লোক তাঁহাকে জানিল না তাহাতে তাঁহার ক্ষতিও নাই, বৃদ্ধিও নাই। ভক্ত সমাজে, ধর্ম্ম পিপাসুর নিকট, গুণীর কাছে তিনি যাবৎ "চন্দ্র সূর্য্য" বিদ্যমান থাকিবেন তাবৎ তিনি সমাদৃত,পূজিত হইবেন। লোকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব চরিতামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে।

আমরা এইরূপ সংক্ষেপে পরমহংসের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করিলাম। ভবিষ্যতে আরও বিশদ করিয়া পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। কর্ত্তা ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে না যেমন নিবীড় বনে দেব মূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তি প্রস্তুত কর্ত্তা তথায় উপস্থিত নাই কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার এই বিশ্বদর্শন করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

২। মনে করিবামাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। রজনী যোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গগণমণ্ডল বিমণ্ডিত হইয়া থাকে কিন্তু দিবাভাগে সেই তারকা বৃন্দ দৃষ্ট হইল না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না ?

৩। দুগ্ধে মাখম আছে। কিন্তু দুগ্ধ দেখিলে মাখম আছে কি না তাহা বালকের বুদ্ধির অতীত। বালক বুঝিতে পারিলনা বলিয়া দুগ্ধকে মাখম বিবর্জ্জিত জ্ঞান করা উচিত নহে। যদ্যপি মাখম দেখিতে ধ।

ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কার্য্য চাই। দুগ্ধকে দধি করিতে হইবে, পরে তাহা হইতে মাখম প্রস্তুত করা যায়। তখন তাহা ভক্ষণে পুষ্টি লাভ করা যাইতে পারে।

৪। সমুদ্রে অতলস্পর্শ জল। ইহাতে কি আছে এবং কি নাই তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে সক্ষম নহে। মনুষ্যের দ্বারা তাহা স্থির হইল না বলিয়া কি সমুদ্রে কিছুই নাই বলিতে হইবে? যদ্যপি কেহ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সমুদ্র তটে পরিভ্রমণ করে তাহা হইলে সময়ে সময়ে কোন কোন মৎস্য কিম্বা জলজন্তু অথবা অন্যান্য পদার্থ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। নতুবা গৃহে বসিয়া সমুদ্রের বিচার করিলে কি ফল হইবে?

৫। লীলা অবলম্বন না করিলে নিত্য বস্তু জানিবার উপায় নাই।

৬। কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্যান আছে। একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে উহার কোন স্থানে আম্রের সার, কোথাও বা লিচু, পেয়ারা, গোলাপজাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল যথা নিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোথাও বা গোলাপ, বেল, জাতি, চম্পক প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্ সমূহ সুবাসিত করিতেছে। কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল

সময়োচিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ সুখ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, কোথাও বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল অবস্থিতি করিতেছে ও স্থানে স্থানে নানাবিধ পুত্তলিকা সংস্থাপিত রহিয়াছে। দর্শক উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে? তাহার কি এমন মনে হইবে যে এই উদ্যান আপনি হইয়াছে। ইহার কেহ সৃষ্টি কর্ত্তা নাই? তাহা কখন নহে। সেই প্রকার এই বিশ্বোদ্যানে যে স্থানে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে তাহা বাস্তবিক স্বভাব কর্ত্তৃক নহে, বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তের সৃজিত পদার্থ।

৭। এই বিশ্বোদ্যান দেখিয়াই লোকে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এক পুত্তলিকা এমন কি যোগি ঋষির পর্য্যন্ত মনাকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। উদ্যানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত?

৮। ঈশ্বর মন বুদ্ধির অতীত বস্তু এবং তিনি মন বুদ্ধিরই গোচর হইয়া থাকেন। যে স্থানে মন বুদ্ধির অতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে তথায় বিষয়াত্মক এবং যে স্থানে উহাদের গোচর কহা যায়, তথায় বিষয় বিরহিত বলিয়া জানিতে হইবে।

৯। ঈশ্বর এক। তাঁহার অনন্ত শক্তি।

১০। ১১। ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি বর্ণনা করিতে

হইলে বহু হইয়া পড়ে। যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে কি বুঝা যায়? বর্ণ, দাহিকা শক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদির সমষ্টিকে অগ্নি বলে। কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নের বর্ণ, অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথবা অগ্নি এবং দাহিকা শক্তি কিম্বা অগ্ন্যুত্তাপ, অগ্নি হইতে পৃথক নহে। অগ্নি বলিলে ঐ সকল শক্তির সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি অভেদ।

১২। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; অচল, অটল, এবং সুমেরুবৎ। তাঁহার শক্তি দ্বারা জগতের সমুদয় কার্য্য সাধিত হইতেছে। যেমন বৃক্ষের গুঁড়ি একস্থানে অচলবৎ অবস্থিতি করে। কিন্তু শাখা প্রশাখা দিক্ ব্যাপিয়া থাকে।

১৩। শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই। অথবা শক্তি আছে বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়।

১৪। অরণ্যে যখন কোন প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন তাহার সৌরভ ইতঃস্তত সঞ্চালিত হইয়া সকলের নিকট সমাচার প্রদান করিয়া থাকে। পুষ্প স্বয়ং কোথাও গমন করে না কিন্তু তাহার সৌরভ শক্তিই তাহার পরিচায়ক। সেইরূপ শক্তিই ব্রহ্মবস্তু নিরূপণ করিয়া দেয়।

১৫। যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে

তাহাকে আদ্যাশক্তি বা ভগবতী কহে। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী তাঁহারই নাম। এই শক্তি হইতেই জড় এবং চৈতন্যপ্রদায়িনী শক্তি জন্মিয়া থাকে। এক বৃক্ষের একটী ফুল হইতে একটী ফল উৎপন্ন হইল। তাহার কিয়দংশ কঠিন, কিয়দংশ কোমল এবং কিয়দংশ অন্যান্য আকারে পরিণত হইয়া যাইল। যেমন বেল। ইহার বহির্য্যাবরক বা খোসা আভ্যন্তরিক কোমলাংশ বা শাঁস এবং বিচি ও সূত্রবৎ গঠনগুলি এক কারণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। সেই প্রকার চৈতন্য শক্তি হইতে জড়ের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

১৬। ব্রহ্মের দুইরূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ বোধ রূপ, কেবলাত্মা সাক্ষী স্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদ বাচ্য। আর যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়।

১৭। ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা কি অর্থাৎ বাস্তবিক গুণ বিবর্জ্জিত কিম্বা সকল গুণের আকর তিনি তাহা মনুষ্যেরা কিরূপে নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে? তিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ এবং তিনিই গুণাতীত। ব্রহ্মও যে বস্তু, ঈশ্বরও সেই বস্তু। যেমন আমিই এক সময়ে দিগাম্বর আবার আমিই আর এক সময়ে শাম্বর।

১৮। ১০টী জলপূর্ণ মৃৎপাত্র অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত হইলে সূর্য্যোদয়ে উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে

সূর্য্যের প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইবে। তখন বোধ হইবে যে দশটী সূর্য্য প্রবেশ করিয়াছে। যদ্যপি একটী একটী করিয়া সমুদয় পাত্রগুলি ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? তখন সূর্য্যও নাই, অথবা পাত্র এবং জলও নাই।

১৯। ব্রহ্মের, সাকার নিরাকার এবং তদতিরিক্ত অবস্থাও আছে।

২০। যেমন ঘণ্টার ধ্বনি। প্রথমে যে শব্দ হয় তাহাকে ঢং বলে, পরে সেই শব্দ যেরূপে ক্রমে ক্রমে বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়। তখন তাহাকে আর কোন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যে পর্য্যন্ত উহাকে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে সাকার কহে। বাক্যের অতীত কিন্তু উপলব্ধির অধিকার পর্য্যন্ত নিরাকার, তাহার পরের অবস্থা বাক্য এবং উপলব্ধির অতীত ইহাকে তৃতীয়াবস্থা কহা যায়।

২১। ওঁকার উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থায় সাকার দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার এবং তদুপরে সাকার নিরাকারের অতীতাবস্থা।

২২। সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল।

২৩। যেমন বরফ এবং জল। ইহার দুইটী প্রত্যক্ষ অবস্থা। একটী কঠিন আকার বিশিষ্ট এবং অপরটী তরল ও আকার বিহীন। জলের এই পরিবর্ত্তন উত্তাপ

এবং তাহার অভাব হীন শক্তি দ্বারা শাধিত হয়। সেই প্রকার সাধকের, জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যূনাধিক্যে ব্রহ্মের সাকার নিরাকার অবস্থা হইয়া থাকে।

২৪। ব্রহ্মের সাকার রূপ জড়পদার্থ সম্ভূত অর্থাৎ কাষ্ঠ মৃত্তিকা কিম্বা কোন প্রকার ধাতু বিনির্ম্মিত নহে। তাঁহার রূপ যে কি এবং কি পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় তাহা বচনাতীত। সে পদার্থ জড়জগতে নাই যে তাহার দ্বারা উল্লেখিত হইবে। জ্যোতিঘন বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু সে যে কি প্রকার জ্যোতি তাহা চন্দ্র, সূর্য্যের জ্যোতির সহিত তুলনা হইতে পারে না। ফলে তাঁহার রূপ অনুপমেয় এবং বচনাতীত। যদ্যপি তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার তুলনা তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিতে হয়।

২৫। এই সাকার মূর্ত্তি যে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরাধীন তাহা নহে। সাধক ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গ স্পর্শনাদি করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

২৬। আদি শক্তি হইতে সাকার রূপের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণ, রাম, শিব, নৃসিংহ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ বিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে তৎসমুদয় সেই আদি শক্তির গর্ভ সম্ভূত। এই জন্য সকল দেবতাকে এক বলিয়া কথিত হয়। যেমন

এক চিনির রস হইতে নানাবিধ মট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা এক মৃত্তিকাকে জালা, কল্‌সি, ভাঁড়, খুরি, প্রদীপ, হাঁড়ি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্ত করা যায়। ইহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি লইয়া বিচার করিলে কাহারও সহিত কাহার সাদৃশ্য নাই। জালার সহিত প্রদীপের কি প্রভেদ তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু উপাদান কারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

২৭। ঈশ্বর এক তাঁহার অনন্ত রূপ। যেমন বহুরূপী গিরগিটী। ইহার বর্ণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেহ তাহাকে কোন সময়ে হরিদ্রা বর্ণ বিশিষ্ট দেখিতে পাইল, কেহ বা নীলাভাযুক্ত, সময়ান্তরে কেহ লোহিত বর্ণ এবং কেহ কখন তাহা সম্পূর্ণ বর্ণ বিবর্জ্জিত দেখিল। এক্ষণে সকলে মিলিয়া যদ্যপি গিরগিটীর রূপের কথা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে? স্থূলে সকলে স্বতন্ত্র কথা বলিবে। যদ্যপি তাহা পার্থক্য জ্ঞানে অবিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থায় অবিশ্বাস করা হইল। কিন্তু কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায়? স্থূল দর্শন করিয়া আদি কারণ স্থির হইতে পারে না। এই জন্য গিরগিটীর নিকটে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমুদায় বর্ণ ক্রমান্বয়ে দেখা যাইতে পারে, তখন এক গিরগিটীর বিভিন্ন বর্ণ তাহা বোধ হইয়া থাকে।

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে হয়। যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিলে তাহার কত তরঙ্গ, ইহাতে কত প্রকার পদার্থ আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

২৮। সাধনের প্রথমাবস্থাতে নিরাকার। দ্বিতীয়াবস্থায় সাকার রূপ দর্শন, তৃতীয়াবস্থায় প্রেমের সঞ্চার হয়।

২৯। কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত সাকার মুর্ত্তি নিত্য সাকারের প্রতিরূপ মাত্র। যেমন স্বাভাবিক আতা দেখিয়া সোলার আতা সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা জড় মুর্ত্তির উপাসনা করে তাহারা বাস্তবিক জড়োপাসক নহে। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জড় নহে। যদ্যপি প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহার তাহাই লাভ হইবে কিন্তু ঈশ্বরভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বর লাভই হইয়া থাকে।

৩০। সাধক যখন সাকার রূপ দর্শন করেন তখন তাহার নিত্যাবস্থা হয়। জড় পদার্থে আর মনাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘ স্থায়ী নহে। সুতরাং তাহাকে পুনরায় জৈবাবস্থায় আসিতে হয়। এ সময়ে তাহার নিত্যাবস্থার দর্শনাদি স্মরণ থাকে।

৩১। যাহার যে প্রকার প্রকৃতি তাহার সেই প্রকৃত্যানুযায়ী ঈশ্বর সাধন করা কর্ত্তব্য।

৩২। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

৩৩। এই গুণত্রয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক গুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন, সত্ত্বের সহিত রজ মিশ্রিত হইলে সত্ত্ব-রজ; রজ-তম সংযোগে রজ-তম এবং সত্ত্ব-তম দ্বারা সত্ত্ব তম ইত্যাদি।

৩৪। যে ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্ম-গরিমা প্রকাশ না পায়; সর্ব্বদাই দয়া দাক্ষিণ্যাদির কার্য্য হয়; রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে; আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না থাকে; স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক রতি-মতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ত্ব-গুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

৩৫। রজ গুণে আত্মাভিমান পরিপূর্ণ থাকে। কোন কোন রিপুর পূর্ণ ক্রিয়া, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বর, ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকে।

৩৬। তম গুণে রজের সমুদয় লক্ষণ পরিপুর্ণ রূপে দেখা যায় এবং তদ্ব্যতীত রিপুগণেরও পূর্ণ কার্য্য হইয়া থাকে।

৩৭। যে ব্যক্তি যে গুণ প্রধান, তাহার তদ্রূপই কার্য্য হইয়া থাকে। এই গুণ ভেদের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যের সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

এই নিমিত্ত সাধন কার্য্যে এক প্রণালী মতে সকলকে নিবদ্ধ রাখা যায় না।

৩৮। যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যে রূপে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বর লাভ হইবেই হইবে।

৩৯। মত, পথ। যেমন এই কালী-বাটীতে আসিতে হইলে কেহ নৌকায়, কেহ গাড়ীতে এবং কেহ হাঁটিয়া আসিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরিশেষে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা যে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে তাহা সকলেরই এক।

৪০। মুক্তি দাতা একজন। সংসার ক্ষেত্রে যাহার যখন বিরাগ জন্মে অন্তর্যামী ভগবান তাহা জানিতে পারেন এবং তিনি সেই সাধকের ইচ্ছা বিশেষে ব্যবস্থা করিয়া দেন।

৪১। কলিকালে ঈশ্বরের নামই একমাত্র সাধন।

৪২। অন্য অন্য যুগে অন্য প্রকার সাধনের নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে এযুগে সিদ্ধ হওয়া যায় না কারণ জীবের পরমায়ু অতি অল্প তাহাতে ম্যালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) রোগে লোকে জীর্ণ শীর্ণ, কঠোর তপস্যা কেমন করিয়া করিবে এই নিমিত্ত নারদীয় ভক্তি মতই প্রশস্ত।

৪৩। ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে নামে বিশ্বাস এবং সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। এই সাধন পথ অবলম্বন ব্যতীত কাহার পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব নহে।

৪৪। বিচার দুই প্রকার অনুলোম ও বিলোম। যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ, ইহাকে বিলোম এবং মাঝ হইতে খোল ইহাকে অনুলোম কহে। যেমন বেল। ইহা খোলা, শাঁস, বিচি, আটা এবং শিরার সমষ্টি, এই বিচারকে বিলোম বলে। অনুলোম দ্বারা উহাদের এক সত্বায় উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

৪৫। শিয়ালদহের গ্যাসের মসলার ঘর। কোন জায়গায় পরি কোথাও মানুষ, কোথাও লাণ্ঠান, কোথাও ঝাড়; কত রকমে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে। গ্যাস কোথা হইতে আসিতেছে কেউ তাহা দেখিতে পাই-তেছে না। যে কেউ স্থূল আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে সে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই অদ্বিতীয় ঘর বলিয়া জানিবে।

৪৬। সদসৎ বিচারকেই বিবেক বলে। বিবেক হইলে বৈরাগের কার্য্য আপনি হইয়া যায়। বৈরাগ্য সাধনের স্বতন্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসী হওয়া যারপর নাই কঠিন কথা। বৈরাগ্য হইলে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কলি-

কালে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা যায় না। হয়ত অনেক কষ্টে কামিনী ত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু অপর দিক হইতে কাঞ্চন আসিয়া আক্রমণ করে। যদ্যপি কামিনী পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চনের দাস হইতে হয় তাহা হইলে তাহার বৈরাগ্য সাধন হয় না। যদিও এক্ষেত্রে একদিকে বৈরাগ্য হইল কিন্তু তাহাতে আরও অপকারের সম্ভাবনা। কামিনী ত্যাগী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কারের এতদূর প্রাবল্য হয় যে, যে অহং বিনাশের জন্য বিবেক বৈরাগ্য তাহারই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার দ্বারা উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং কামিনী কাঞ্চন সংলীপ্ত মূঢ় বিষয়ী অপেক্ষা সহস্র গুণে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

৪৯। সন্ন্যাসী ত্যাগী হইলে অর্থোপার্জ্জন কিম্বা কামিনী সহবাস করা দূরে থাক যদ্যপি হাজার বৎসর সন্ন্যাসের পর স্বপনে কামিনী সহবাস হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তদ্দ্বারা রেত পতন হইয়া যায়, অথবা অর্থের দিকে আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে এত দিনের সাধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

সন্ন্যাসীর কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসে দেখাইয়াছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইয়াছিলেন এই নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৪৮। সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী অর্থেই ত্যাগী, তখন লোকালয়ে তাহাদের স্থান নহে।

৪৯। দুই প্রকার সাধক আছে। বাঁদরের ছানার স্বভাব এবং বিড়াল ছানার স্বভাব। বাঁদর ছানা জানে যে, তার মাতাকে না ধরিলে, সে কখন স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না। কিন্তু বিড়াল ছানার সে বুদ্ধি নাই। সে নিশ্চয় জানে যে তার মাতার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে রাখিবে। সে কেবল ম্যাও ম্যাও করিতে জানে। সন্ন্যাসী সাধক বা কর্ম্মীদিগের স্বভাব বাঁদর ছানার ন্যায়। অর্থাৎ আপনি খাটিয়া খুটিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় কর্ত্তা জানে তাঁহার চরণে আত্ম নিবেদন করিয়া বিড়াল ছানার ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে।

৫০। জ্ঞান এবং ভক্তি এই পথ লইয়া সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীরা বলে যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বর লাভ হয় না এবং ভক্তি মতে তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞান পুরুষ। সে বহির্বাটীর খপর বলিতে পারে এবং ভক্তি স্ত্রীলোক সে অন্তঃপুরের সমাচার দিতে সক্ষম। এই নিমিত্ত জ্ঞান

পথে যে জ্ঞানোপার্জ্জন হয় তাহা সম্পূর্ণ স্থূল ও বাহিরের কথা। ভক্তদিগের মতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

৫১। জ্ঞান অর্থে জানা এবং বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ-রূপে জানা। এই বিজ্ঞানের পর অর্থাৎ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধকের মনের ভাব যেরূপে প্রকাশিত হয় সেই কার্য্যকে ভক্তি বলে। ইহাকে শুদ্ধজ্ঞানও কহা যায়।

৫২। ভক্তেরা যখন যেরূপ দর্শন করেন তাহা তাঁহাদের চরম নহে। কারণ সে অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। দেহ রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন এবং অনাহারে থাকিলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা ভগবানের নিয়ম। যাঁহারা ভগবানের রূপ লইয়া অবিচ্ছেদে কাল হরণ করিতে চাহেন তাহার একুশ দিনের অধিক দেহ থাকিতে পারে না। দেহান্ত হইয়া যাইলে তাহার যে কি অবস্থা হয় তাহা কাহার বলিয়া দিবার শক্তি নাই। দেহ বিচারে জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমাধি হওয়া এবং ভক্তের এই অবস্থা একই প্রকার।

৫৩। গৃহস্থেরা একটা বড় মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিল। কেহ ঐ মৎস্যের ঝোল, ভাজা, তেলহলুদে চড়চড়ী, পোড়া, ভাতে, অম্বলে ভক্ষণ করিল। এস্থানে মৎস্য এক কিন্তু ভাবের কত প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৫৪। এক ব্যক্তি কাহার পিতা, কাহার খুড়া, কাহার জ্যেঠা, কাহার মামা, কাহার মেশ, কাহার পিসে, কাহার ভগ্নিপতি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাসুর ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক অদ্বিতীয় কিন্তু তাহার ভাবে অসীম প্রকার প্রভেদ রহিয়াছে।

৫৫। যেমন জল এক পদার্থ। দেশ ভেদে কাল-ভেদে এবং পাত্র ভেদে নামান্তর হয়। যেমন বাঙ্গালায় জলকে বারি, নীর্ বলে, সংস্কৃতে অপ বলে, হিন্দিতে পাণি বলে, ইংরাজিতে ওয়াটার ও একোয়া বলে। কাহার কথা না জানিলে কেহ বুঝিতে পারে না কিন্তু জানিলে কিম্বা না জানিলে ভাবের ব্যতিক্রম হয় না।

৫৬। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব। যাহার যে নামে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। অনন্ত ব্রহ্মের রাজ্যে কোন বিষয়ের চিন্তা হইতে পারে না অথবা কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৫৭। যে তাঁহাকে সরল বিশ্বাসে অকপট অনুরাগে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে তিনি তাহার অতি নিকট হইয়া থাকেন।

অজান্তে ডাকিলে অথবা না ডাকিলেও তিনি

তাহাকে কৃপা করেন। কিন্তু অবস্থা ভেদে কার্য্যের তারতম্য হয়।

৫৮। যদ্যপি কাঁহার সাধনের প্রয়োজন হয়। তিনি তাহার সদ্‌গুরু সংযোজন করিয়া দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই।

৫৯। বকলমা অর্থাৎ আত্ম সমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

৬০। একটী পক্ষী কোন জাহাজের মাস্তুলে বসিয়া থাকিত, চতুর্দ্দিকে জল, উড়িয়া যাইবার স্থান ছিল না। পক্ষী মনে মনে বিচার করিল যে আমি এই মাস্তুলকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান করিয়া বসিয়া আছি হয়ত কিঞ্চিৎ দূরে অরণ্য থাকিতে পারে। এই স্থির করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। সে যে দিকে ধাবিত হইল সেই দিকে অনন্ত জল বারিধি কোথাও কূল কিনারা পাইল না। যখন চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল তখন সেই মাস্তুলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আশ্রয় লইল। সেই দিন হইতে মাস্তুল সম্বন্ধে অদ্বিতীয় বোধ স্থির হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। ব্রহ্মতত্ত্বও সেইরূপ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত ভাব জ্ঞাত না হইলে তাঁহার প্রতি আত্ম সমর্পণ করা যায় না। এই জন্য সাধনের সময় বিচার আবশ্যক।

৬১। নাম অবলম্বন করিলে বিচার করিতে হয় না।

নামের গুণে সকল সন্দেহ সকল কুতর্ক দূর হয়, নামে বুদ্ধি শুদ্ধি হয়, এবং নামে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু নামে বিশ্বাস করিতে হইবে।

৬২। যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া থাকিলে করতালি দ্বারা তাহাদের উড়াইয়া দেওয়া যায় তেমনি নাম সঙ্কীর্ত্তন কালে করতালি দিয়া নৃত্য করিলে শরীর রূপ বৃক্ষ হইতে পাপ পক্ষীরা পলাইয়া যায়।

৬৩। ধ্যান কর্ব্বে বনে, মনে এবং কোনে।

৬৪। যাহারা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে চাহে তাহারা কোন প্রকারে কামিনী কাঞ্চনের সংস্রব রাখিবে না। তাহা না করিলে কস্মিন কালে কাহারও সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির উপায় নাই।

ক। যেমন খৈ ভাজিবার সময় যে খৈটী ভাজনা খোলার উপর হইতে ঠিকরিয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, তাহার কোন স্থানে দাগ লাগে না। কিন্তু খোলায় থাকিলে তাপযুক্ত বালির সংস্রবে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাগ ধরিতে পারে।

খ। কাজলকী ঘর্‌মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর্ লাগে। যুবতী কি সাত মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া কাম জাগে পর্ জাগে। অর্থাৎ কাজলের (কালি) ঘরে যতই সাবধানে বাস করিতে চেষ্টা করা হউক গাত্রে কালির বিন্দু লাগিবেই লাগিবে।

সেই প্রকার যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত অতি সুচতুর ব্যক্তি একত্রে বাস করিলেও তাহার কিঞ্চিৎ কামোদ্রেক হইবেই হইবে।

গ। যেমন আচার তেঁতুল, দেখিলে অম্ল রোগ-গ্রস্থ ব্যক্তিবও উহা আস্বাদন করিবার জন্য লোভ জন্মিয়া থাকে। সে জানে যে অম্ল ভক্ষণ করিলে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে কিন্তু পদার্থগত ধর্ম্মের এমনই প্রবল প্রলোভন যে তত্রাপি, তাহার মনের আবেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারে না।

৬৩। যাহারা একবার ইন্দ্রিয় সুখ আস্বাদন করিয়াছে তাহাদের যাহাতে আর সেভাবের উদ্দী-পন না হইতে পারে এমন সাবধানে বাস করা কর্ত্তব্য। কারণ চক্ষে দেখিলে এবং কর্ণে শুনিলে, মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মনে একবার কোন প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গেলে তাহা তাহার চির জীবনে ভুল হয় না। একদা একটী দামড়া গরুকে আর একটী গরুর উপর ঝাঁপিতে দেখিয়া তাহার কারণ বাহির করায় জানা গেল যে উহাকে যখন দামড়া করা হয় তৎপূর্ব্বে তাহার সংসর্গ জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

ক। কালীবাটীতে একটী অতি পণ্ডিত, সাধক এবং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। পল্লির

স্ত্রীলোকেরা যখন গঙ্গার জল আনিবার জন্য তাহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিত সে এক দৃষ্টিতে সকলের প্রতি চাহিয়া থাকিত। এক দিন কোন যুবতীকে দেখিয়া নস্য লইতে লইতে বলিয়াছিল "এ আওরাৎ টো বড়া খোপস্থরত্ হ্যায়।" সে যখন ঐ কথা লোকে নিকট প্রকাশ করিবা ফেলিয়াছিল, তখন তাহার মনের বেগ কতদূর প্রবল হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আর এক সময়ে আর একটী সাধু কোন স্ত্রিলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে তজ্জন্য তিরস্কার করায় বলিয়াছিল যে "পাপ কি? হইয়াছে কি? সকলই মায়ার কার্য্য, আমি কে তাহারই স্থির নাই, আমার কার্য্য কেমন করিয়া সত্য হইবে?"

৬৪। যেমন দুর্গ মধ্যে থাকিয়া প্রবল শত্রুর সহিত অল্পসেনা দ্বারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায়। তাহাতে বলক্ষয় হইবার আশঙ্কা অধিক থাকে না এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত ভোজ্য পদার্থের সাহায্যে অনাহার জনিত ক্লেশ অথবা তাহা পুনরায় সংগ্রহ করিবার আশু চিন্তা করিতে হয় না। সেই প্রকার সংসারে থাকিলে সাধন ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে।

৬৫। নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

৬৬। যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে, সন্তানদিগকে লালন পালন করে, তাহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে কিন্তু মনে জানে যে তাহারা তাহার কেহই নহে।

৬৭। যখন কেহ কোন সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যায় তখন তাহাকে তাহার পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। কেহ না থাকে অর্থাৎ সকল বন্ধন পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করা হয়।

৬৮। সংসারে সকলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং তজ্জন্য সকলের নিকটেই ঋণী থাকিতে হয়। এই ঋণ মুক্তির ব্যবস্থাও আছে। উপায়হীন পিতা মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ হয় না এবং তাঁহারা সঙ্গতীপন্ন কিম্বা অন্যান্য পুত্র কন্যা থাকিলেও তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত দুইটী পুত্র না জন্মে সে পর্য্যন্ত স্ত্রীর ঋণ বলবতী থাকে। সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সন্তানের ও স্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিলে ঋণ মুক্তির বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে।

৬৯। মনই সকল কার্য্যের কর্ত্তা। জ্ঞানী বল অজ্ঞানী বল সকলই মনের অবস্থা। মনুষ্যের

মনেই বন্ধ এবং মনেই মুক্ত; মনেই অসাধু এবং মনেই সাধু, মনেই পাপী এবং মনেই পুণ্যবান। অতএব মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে পারিলে পূর্ণ-সাংসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্য সাধনের আর অপেক্ষা রাখে না।

(ক) কোন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। এমন সময়ে তথায় দুইটী ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল উপবেশন করিবার পর তন্মধ্যে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, যে ছাই ভাগবৎ শুনিয়া আর আমাদের কি হইবে? বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া ততক্ষণ আনন্দ করিলে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা শুনিল না। প্রথম ব্যক্তি বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইয়া বারাঙ্গনার নিকট চলিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট বসিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে করিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে এতক্ষণ বন্ধু কত আনন্দই সম্ভোগ করিতেছে। কতই রস রঙ্গের তুফান উঠিতেছে, তাহার সীমা নাই। আর আমি এই স্থানে বসিয়া কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুনিতেছি তাহাতে কি লাভ হইবে? প্রথম ব্যক্তি যদিও বেশ্যার পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিল বটে কিন্তু সে অভ্যস্ত সুখের সুখ নিমেষ অন্তর্হিত হইয়া যাইলে দ্বিতীয়

ব্যক্তির শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা অনুভব করিয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ভাবিল যে এতক্ষণ হয় ত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইয়া বাল্যলীলা বর্ণনা হইতেছে। নাম করণ কালে গর্গ মুনির সম্মুখে যখন বালক কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া বিষ্ণুরূপে উদয় হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল। আহা! এতক্ষণে হয় ত জনে জনে তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছেন। সে এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিল। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে এই দুই ব্যক্তি দুই স্থানে থাকিয়া মনের অবস্থা গুণে যে বেশ্যার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল তাহার শ্রীমদ্ভাগবতের ফল লাভ হইয়া গেল এবং যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট বসিয়া রহিল তাহার বেশ্যাগমনের পাপ জন্মিল।

(খ) কোন দেশে এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এক শিবালয়ে বাস করিতেন। শিবালয়ের সম্মুখে এক বেশ্যার বাটী ছিল। সাধু সর্ব্বদাই সেই বেশ্যাকে ধর্ম্ম কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ দিতেন। বেশ্যা কিছুতেই আপন বৃত্তি ছাড়িতে পারিল না সাধু তদ্দর্শনে অতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, দেখ তোর পাপের ইয়ত্তা নাই। তুই যে সকল পাপ করিয়াছিস্ ও অদ্যাপি করিতেছিস

তাহা গণনা করিলে তোর্ ভীষণ পরিণাম ছবি আমার মানসপটে সমুদিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি এ পাপ কার্য্য হইবে বিরত হ', বেশ্যার প্রাণ সে কথা বুঝিল এবং মনে বড় সাধ হইল ভগবান কি এমন দিন দিবেন, যে আর যাহাতে উদর পোষণের জন্য জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি না করিতে হয়, কিন্তু অবস্থা তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। পাঁচজনে তাহাকে এতই নিগ্রহ করিল যে তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মনোসাধ রক্ষা করিতে হইতে হইল। সাধু এই প্রকার বিপরীত ঘটনা দেখিয়া মনে মনে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়া, যত ব্যক্তি আসিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করিবার জন্য ক্ষুদ্র প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ঐ প্রস্তর সংখ্যা স্তূপাকার হইয়া পড়িল। একদিন বেশ্যা প্রাসাদের উপরে দণ্ডায়মান আছে এমন সময়ে সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ্ তোকে তৃতীয়বার বলিতেছি এখন পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরির নাম অবলম্বন কর; নতুবা এই দেখ্ অল্প দিবসের মধ্যে তুই যখন এত পাপ করিয়াছিস তখন ভাবিয়া দেখ তোর্ আজীবনের সমুদয়, পাপের জমা করিলে কি ভয়ানক হইবে, বলিয়া সেই প্রস্তর রাশি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বেশ্যা ঐ

প্রস্তর রাশি দেখিয়া একেবারে ভয়ে আকুলিত হইয়া পড়িল। তখন মনে হইল যে আমার গতি কি হইবে? কেমন করিয়া উদ্ধার হইব? শ্রীহরি কি আমার প্রতি দয়া করিবেন না, পতিতপাবন তিনি, আমার মত পতিতের কি গতি হইবে না? তদবধি তাহার প্রাণে ব্যাকুলভাব সঞ্চার. হইল। সে সর্ব্বদা হরি হরি বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি পুরুষ সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। যখনই তাঁহার গৃহে লোক আসিত সাধু অমনই একটী প্রস্তর আনিয়া পাপ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন এবং বেশ্যা সেই সময়ে মনে মনে হরিকে আপন দুঃখ এবং দুর্ব্বলতা জানাইত। সে বলিত, যে হরি কেন আমাকে বেশ্যা বৃত্তি দিয়াছ, কেন আমার বেশ্যার গর্ভে সৃষ্টি করিয়াছ। কেন আমার এমন অপবিত্র করিয়া রাখিয়াছ এবং কেনই বা আমার উদ্ধার করিতেছ না। এই বলিয়া আপনা-পনি নীরবে রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইবার পর এমনই ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল, যে একদিনে ঐ বেশ্যা এবং সন্ন্যা-সীর মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল। তাহাদের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যাইবার জন্য যমদূত ও বিষ্ণুদূত উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। যমদূত যাইয়া

সন্ন্যাসীর পদযুগল সুদৃঢ় করিয়া বন্ধন করিল এবং বিষ্ণুদূত বেশ্যার সম্মুখে যাইয়া বলিল মা! এই রথে আরোহণ কর, হরি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।

বেশ্যা যখন রথারোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, পথি মধ্যে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী বেশ্যার এ প্রকার সৌভাগ্য দেখিয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন এই কি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার। আমি চিরকাল সন্ন্যাসী হইয়া সংসারে লিপ্ত না হইয়া কঠোরভাবে দিন যাপন করিলাম তাহার পরিণাম যমদূত যন্ত্রণা? আমি সংসার নিগড় ছেদন করিয়াছিলাম কি যমদূতের দ্বারা বন্ধন হইবার জন্য! আর এই বেশ্যা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কত পরিবার ধ্বংশ করিয়াছে, তাহার কি না বৈকুণ্ঠে গমন হইল? হায় হায়। ভগবানের একি অদ্ভুত বিচার! বিষ্ণুদূত কহিল, যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য। ভগবানের সূক্ষ্ম এবং অদ্ভুত বিচার তাহার কি সন্দেহ আছে? যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমনই লাভ হইয়া থাকে। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি: তোমাদের দুই-জনের মধ্যে কে হরিকে ডাকিয়াছে? তুমি বাহ্যিক আড়ম্বর করিয়াছ, সন্ন্যাসের ভেক করিয়া লোকের নিকট গণ্যমান্য হইবার ইচ্ছা ছিল, কল্পতরু ভগবান্

সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তুমিত তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হও নাই? ব্যাকুল হওয়া দূরে থাক একদিন ভুলিয়াও তাঁহাকে চিন্তা কর নাই। তাহাও যাক। তুমি মনে কি করিয়াছ তাহা কি স্মরণ আছে? যে বেশ্যাকে বেশ্যা বলিলে সে যতবার পাপাচরণ করিয়াছে বলিয়া তুমি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলে, প্রকৃতপক্ষে সে বেশ্যাবৃত্তি তোমারই হইয়াছে। কারণ, বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে বলিয়া তাহা তুমিই চিন্তা করিয়াছ। বেশ্যা স্থূল দেহে বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে তাহাতে আমাদের অধিকার নাই। তাহার গতি ঐ দেখ কি হইতেছে? কুক্কুর শৃগালে ভক্ষণ করিতেছে; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আমাদের কার্য্য। তাহা হরি পাদপদ্মে স্মরণাগত হইয়াছিল সুতরাং হরিপদে উহার বাসস্থান না হইয়া আর কোথায় হইবে? তোমার স্থূল দেহ পবিত্র ছিল তাহার পবিত্র গতি হইতেছে। বেশ্যার ন্যায় শৃগাল কুকুরের তাহা ভক্ষণীয় না হইয়া সন্ন্যাসীরা মিলিত হইয়া জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে এবং সূক্ষ্ম শরীরে বেশ্যাবৃত্তি করায় বেশ্যার গতি যম যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে। বল সন্ন্যাসী বল? ইহা কি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার নহে?

৭০। যেমন সমুদ্রে জাহাজ পতিত হইলে জল

হিল্লোলের গত্যানুসারে তাহা পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু তন্মধ্যস্থ কম্পাসের উত্তর দক্ষিণমুখী সূচিকা আপন দিক পরিভ্রষ্ট হয় না।

৭১। যে জীব সংসারে থাকিয়া মনে মনে একবার হরি বলিয়া স্মরণ করিতে পারে, ভগবান তাহাকে শূর বা বীর ভক্ত বলেন।

একদা নারদের মনে ভক্তাভিমান হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ নারদ। ঐ গ্রামে আমার একটি পরম ভক্ত আছে, তুমি যাইয়া একবার তাহাকে দর্শন করিয়া আইস। নারদ প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভক্ত গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক জন কৃষক স্কন্ধদেশে লাঙ্গল স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নারদকে কোন কথা না বলায় তিনি উক্ত কৃষকের গৃহে প্রবেশ না করিয়া বহির্ভাগেই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কৃষক গৃহে প্রত্যাগমন করিল, স্নানাদি করিয়া আর একবার শ্রীহরির নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আহার করিল। পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্ষেত্রে যাইবার সময় আর একবার শ্রীহরি বলিল এবং সায়ংকালে গৃহে পুনরাগমন করিয়া শয়ন করিবার সময়ে শ্রীহরি বলিয়া নিদ্রা যাইল। নারদ এই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভগবান কি আমার এই দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন? তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

পরদিন কৃষকের আদ্যন্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলে

শ্রীকৃষ্ণ নারদকে একটী মৃন্ময় পাত্র পরিপূর্ণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া বলিলেন, নারদ! তুমি এই দুগ্ধ পাত্রটী লইয়া সমগ্র পৃথিবী, পরিভ্রমণ করিয়া আইস। সাবধান যেন দুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়া না পড়িয়া যায়। নারদ যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যথা-সময়ে প্রত্যাগমন করিয়া ভগবানকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ! বল দেখি অদ্য আমাকে কয়বার স্মরণ করিয়াছিলে? নারদ বলিলেন না প্রভু! আপনাকে একবারও স্মরণ করিতে পারি নাই। দুগ্ধের দিকেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। অন্য মন হইলে পাছে দুগ্ধ পড়িয়া যায় সেই জন্য আমি কোন দিকে মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, নারদ! তোমার ন্যায় ভক্ত এক পাত্র দুগ্ধের জন্য আমায় বিস্মৃত হইয়াছিল, আর সেই কৃষক সংসার রূপ বিশ মোণ বোঝা লইয়া তথাপি আমায় দিনের মধ্যে চারিবার স্মরণ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভক্ত কে?

৭২। যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছে তাহারা বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী পুত্র, পরিবার, পিতা, মাতা প্রভৃতির সমুদয় কার্য্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে, তাহার প্রতি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(ক) যেমন লেখা পড়া শিখিলে পণ্ডিত হয় তাহার

বিবিক্ত কি? কিন্তু কালীদাসের ন্যায় হঠাৎ বিদ্যা হওয়া ঈশ্বরের করুনা।

(খ) এক ব্যক্তি অদ্য অতি দীন হীন রহিয়াছে। কল্য কোন ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া একেবারে আমীরের তুল্য হইয়া পড়িল।

(গ) সাংসারীক জীবেরাও কোন্ সময়ে ভগবানের দয়া লাভ করিয়া যে হটাৎ সিদ্ধ হইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? এ প্রকার অবস্থা শত শত বর্ষ সাধনেও হইবার নহে।

যাহারা ভগবানের কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন' তাহাদের নিয়ম বিধি কিছুই নাই। ভিক্ষুকের কি নিয়ম হইতে পারে? তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের এই জন্য সাধন ভজনের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহারা ভগবানের পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে আবশ্যক মত কার্য্য করিয়া যান।

৭৩। অনেকে বলে যে একটা মন কেমন করিয়া সংসার এবং ঈশ্বরের প্রতি এককালে সংযোগ করিবে? ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভবে।

(ক) যেমন ছুতরদের স্ত্রীলোকেরা চিড়া কুটীবার সময়ে একমনে ৫টী কর্ম্ম করিয়া থাকে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চিড়া উল্টাইয়া দেয়, তাহাতে মনের কিয়দংশ সম্বন্ধ থাকে। বাম হস্ত দ্বারা একবার ক্রোড়স্থ সন্তানের মুখে স্তনার্পণ করে ও মধ্যে মধ্যে ভাজনা খোলায় চালগুলি উল্টাইয়া দেয় ও উনুন নিবিয়া যাইলে তুসগুলি উননের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে হয়, ইহাতেও মনের সংযোগ

প্রয়োজন। এমন সময় কোন খরিদ্দার আসিলে তাহার সহিত পাওনা হিসাব করে। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে তাহার একটী মন কিরূপে এতগুলি কার্য্য এক সময়ে করিতে পারিতেছে। তাহার ষোল আনা মনের মধ্যে বারআনা রকম দক্ষিণ হস্তে আছে। কারণ যদ্যপি অন্য মনস্ক বশতঃ হস্তের উপর ঢেঁকি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সকল কার্য্য বন্ধ হইবে এবং অবশিষ্ট চারি আনায় অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অভ্যাসে কি না হইতে পারে? ঘোড়া চড়া অতি কঠিন, অভ্যাস হইলে তাহার উপরও অবলীলাক্রমে নৃত্য করিতে পারা যায়।

৭৪। কোন ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হইলে সে গৃহের যাবতীয় কার্য্য করিয়াও অনবরত তাহার উপপতিকে হৃদয়ে চিন্তা এবং ইচ্ছামত সময়ে তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ।

৭৫। অবস্থা সঙ্গত কার্য্য না করিলে তাহাকে পরিণামে ক্লেশ পাইতে হয়। যেমন—

(ক) স্ফোটক হইলে তাহাকে তখনি কর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিৎ নহে। তাহার যখন যে প্রকার অবস্থা হইবে তখন তাহাকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। কখন গরম জলের সেক্, কখন পুল্টিস দিতে হয়। কিন্তু যখন উহা পরিপক্ক হইয়া মুখ তুলিয়া উঠে তখন তাহাকে কর্ত্তন করিয়া দিলে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) যেমন ক্ষত স্থানের মামড়ী ধরিয়া টানিলে

উহা ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য শোণিত স্রোত হইয়া থাকে। কিন্তু কালাপেক্ষা করিয়া থাকিলে, যে অবস্থায় শরীর হইতে উহা বিযুক্ত হইবার সময় হইবে তখন আপনিই পতিত হইয়া যাইবে।

(গ) অনেকে অন্ন কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করা সুকঠিন বিবেচনায়, গৃহ ত্যাগ করিয়া সাধনের ছলনায় লোক প্রতারণা করিয়া থাকে। তাহারা মুখে বলে যে সংসার অসার। স্ত্রী পুত্র কে? পিতা মাতা কে কাহার? ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসে বলে না। তাহারা সুবিধা পাইলে কার্য্য লোভ ছাড়ে না, উত্তম আহারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং সুবিধা মত বিষয় কর্ম্ম হইলেও তাহা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

(ঘ) অনেকে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং বিদেশে একটা চাকরীর সংস্থান করিয়া পরিবারকে পত্র লিখিয়াছে যে তোমরা চিন্তিত হইও না আমি শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।

(ঙ) এই শ্রেণীর লোকেরা অতি হীন বুদ্ধি পরিচায়ক। তাহারা যে ক্লেদ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাই আবার উপাদেয় বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়

৭৬। যাহার এখানে আছে তাহার সেখানে আছে। যাহার এখানে নাই তাহার সেখানে নাই।

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।